১   ২́   ৩
। র্সা   পণপা মপমা I রা -মা -রা । না   -সা   ] II II
ছে   র০০ হি০০ র ০ ০ হি   ০   ০

সোণার হার

নবম পরিচ্ছেদ।

যে সৈনিক মৃদ্‌কল হইতে প্রীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই শাহজাদা হাসান। কুলবর্গে আনীত হইয়া প্রীতা সুলতান ফিরোজের আদেশে তাঁহার ভগ্নীর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হাসানের সহিত তাহার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর হাসান পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নয়নের আলো! 'প্রীতা' শব্দের অর্থ কি আমাকে বলিয়া দাও।" প্রীতা অবনতমুখে নীরব রহিল দেখিয়া হাসান পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন। প্রীতা কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "উহা ত' নামমাত্র। নামের আবার কি অর্থ থাকিবে, শাহজাদা?" উত্তর হাসানের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "নামের অর্থ থাকে না? তাহা হইলে তুমি আর প্রীতা নও। দিনের আলো জিনিয়া তোমার রূপ! তোমার সৌন্দর্য্যের প্রভায় দিবসের সূর্য্য ম্লান হইয়া ঐ সুদূর পর্ব্বতের অন্তরালে আপনাকে আবৃত করিতেছে। তুমি আজ হইতে নেহার উন্‌নেসা।"

বিবাহের পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ঝটিকার পূর্ব্বে যেমন ঈশান কোণে মেঘরাশি সমবেত হইতে থাকে, গগনের বজ্রবিষাণ যেমন মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জিয়া উঠে, সেইরূপ দিনের পর দিন সমগ্র বাহমনী-রাজ্যের সৈন্যদল একত্র হইতেছিল এবং রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে রণকোলাহল জাগিয়া উঠিতেছিল। সুলতান-ভ্রাতা আহমদ মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বাহমনী-রাজ্যের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করিয়া মজঃফর শাহ্ ও মালব সুলতান যে স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন, আহম্মদ নানাকারণে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সুলতানদ্বয় কাপুরুষের ন্যায় আপন আপন রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। সে-সময় আহমদের সৈন্য-সংখ্যা অল্প হইলেও তিনি তাঁহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতেন কিন্তু ভ্রাতার আদেশে সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তখন সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেও আহমদের অন্তর হইতে প্রতিফল প্রদান করিবার বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই। এতদিন পরে তাহার সুযোগ আসিয়াছে। ভ্রাতার অনুমতি লইয়া খান্ খানান্ আহমদ্ মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন।

রাজধানীর সর্ব্বত্র ব্যস্ততা ও কোলাহল;

কিন্তু বিশাল প্রাসাদের অন্তঃপুরে কোলাহল-ব্যস্ততার কোন লক্ষণ ছিল না। অন্তঃপুরের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি নদীর স্রোতের ন্যায় ধীর-ভাবে চলিয়া যাইতেছিল। প্রণয়ের মধুর লীলা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, ঈর্ষ্যার অন্তর্দাহ, কপটতা, বিলাসের অপরূপ সজ্জা, রমণীর কলহাস্য, রুদ্ধ মর্ম্মবেদনা, সঙ্গীতের ঝঙ্কার, পুষ্পের সুগন্ধ, অলঙ্কারের শিঞ্জিত ও অলঙ্কার-বিচ্ছুরিত আলোক-কণা প্রভৃতি প্রাসাদের দৈনিক জীবনের উপাদানগুলি যথাযথ বিরাজ করিতেছিল।

প্রাসাদের একটী কক্ষে বিচিত্র পরিচ্ছদে কম তনু ভূষিত করিয়া প্রীতা বসিয়া ছিল। পত্র-পুষ্পের প্রতিকৃতি-শোভিত কোমল আসনের উপর উপবিষ্ট প্রীতাকে সজীব পুষ্পগুচ্ছের মতই বোধ হইতেছিল। মুক্তা-খচিত সুরঞ্জিত ক্ষুদ্র পাদুকাদ্বয়ের একটি চরণ-সংলগ্ন, অপরটী পদতল-ভ্রষ্ট হইয়া আসনের নিকটেই পতিত আছে। প্রীতার কেশ ও কর্ণের উপর কয়েকটি পুষ্প। কুসুমমাল্য ও পুষ্পস্তবকের গন্ধে কক্ষ ভরিয়া আছে।

শাহজাদা হাসান কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসান বলিলেন, "নেহারু! পিতা আজ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।" প্রীতা স্বামীর প্রতি একটী প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিল। হাসান বলিলেন, "আমার দোষ যথেষ্ট আছে। তুমি মাথা নাড়িলেও কথাটি সত্য। আমি রাজ-সভায় যাই না, রাজকার্য্য দেখি না, সৈন্য-পরিদর্শনের সময় উপস্থিত থাকি না, কেবল প্রাসাদে ও সঙ্গীত-শ্রবণে কাল হরণ করি; পিতার কোন সহায়তা করি না।" প্রীতা বলিল, "কেন তুমি এমন কর?" হাসানের চক্ষু যে ভাষা বলিল, ওষ্ঠ তাহা বলিল না। হাসান বলিলেন, "নেহারু! আমি রাজ্যশাসনের উপযুক্ত নহি।" প্রীতা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কেশ-চ্যুত পুষ্পটি হর্ম্ম্যতল হইতে কুড়াইতেছিল। সেই অবসরে তাহার অবনত মস্তক হইতে আর একটী পুষ্প পতিত হইল। হাসান প্রীতাকে বিব্রত দেখিয়া বলিলেন, "অলঙ্কার উপযুক্ত নয় বলিয়া আপনিই স্থান-চ্যুত হইতেছে। আমি ভাবিতাম আমিই বুদ্ধিমান্, এখন দেখিতেছি আমাপেক্ষা ফুল-দু'টি বেশী বুদ্ধিমান্, কারণ তাহাদের একটু লজ্জাবোধ আছে।" পুষ্পদ্বয়টি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে প্রীতা বলিল, "পুষ্পের বুদ্ধি থাকা না থাকা সমান; কারণ, এই দেখ, আমি ও-দুটি আবার পরিলাম। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে কেন অসন্তুষ্ট করিতেছ?" হাসান বলিলেন, "পিতার এখন ইচ্ছা আমি অন্যতম সেনাপতিরূপে যুদ্ধে গমন করি।" প্রীতা বলিল, "তোমার তাহাতে অনিচ্ছা কেন?" হাসান বলিলেন "যুদ্ধ পৃথিবীর অভি-শাপ। হত্যা ও লুণ্ঠন রাজার বিজয়কেতনের দুই সহচর। যদি রক্তরাগে পৃথিবীর অঙ্গ রঞ্জিত করিয়া রাখা খোদার বাসনা হইত, তাহা হইলে তিনি আকাশকে এত সুনীল ও পৃথিবীকে এত শ্যামল করিয়া গড়িতেন না। মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ ও যুদ্ধের হুঙ্কার যদি তাঁহার প্রিয় হইত, তাহা হইলে তিনি বনবিহঙ্গের কণ্ঠ ভরিয়া এত সুধার ধারা ঢালিয়া দিতেন না। তুমি ত' যুদ্ধ দেখ নাই, নেহারু! দূরে দরিদ্রের কুটিরশীর্ষে

অগ্নির কুন্ডফণা নৃত্য করিতেছে, পুঞ্জীকৃত ধূমরাশিতে সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে, যখন এক-একবার দেখা যাইতেছে তখন তাহার মূর্ত্তি রক্তের ন্যায় লোহিত। রণক্ষেত্রে শোণিতের নদী, হতাহত যোদ্ধার বুকে রক্তের দাগ—দিগন্তের দূর রেখার উপর অস্তগামী সূর্য্য মানুষের নৃশংসতা দেখিয়া লজ্জায় লোহিত হইয়া গিয়াছে!”

একটি মর্ম্মর-বেদীর উপর দেহ রক্ষা করিয়া প্রীতা অবস্থান করিতেছিল। তাহার মূর্ত্তি তখন এত স্থির যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় সে যেন সেই পাষাণ-বেদীর উপর স্থাপিত একটী পাষাণ-প্রতিমা। সে ব্যথা-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিল, “শাহজাদা! বীর তুমি, যুদ্ধে সঙ্কোচ তোমার সাজে না।” হাসান পত্নীর দক্ষিণ কর আপনার করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “দেশ আক্রান্ত হইলে আমি দেহের শেষ শোণিত-বিন্দু বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহি। দেশ আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই তোমাকে পাইয়াছি, নেহারু! কৃষ্ণাতীরে যুদ্ধের সময় কোন গ্রামে একটি প্রাচীন হিন্দু-মন্দির দেখিতেছিলাম। সে মন্দির কোন স্ত্রী-দেবতার। মন্দিরের এক জন উপাসক ব্যতীত গ্রামে কেহ ছিল না। সেই ব্যক্তির নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম একবার সমুদ্রের সহিত জিনদের যুদ্ধ হইয়াছিল—ফলে সমুদ্র হইতে এক পরী উঠিয়া আসিলেন। সেই পরীর মূর্ত্তি মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সে-দিন হিন্দু-মুসলমানে যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, নেহারু।”

হাসান দেখিতেছিলেন পত্নীর মসৃণ স্বচ্ছ গণ্ডে শোণিতের চঞ্চল লীলা। কোকনদ বেষ্টন করিয়া সরোবরের নীল বারিরাশি যেমন তালে তালে নৃত্য করে, সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ প্রীতার সুন্দর বদন-মণ্ডলের চতুর্দ্দিক্‌ ঘেরিয়া দুলিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বদনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। সে পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার মানসে বলিল, “তোমার এ যুদ্ধে অনিচ্ছার কারণ সুলতান শুনিলে কি বলিবেন?” হাসান বলিলেন, “পিতা আমার মনের ভাব পূর্ব্ব হইতেই জানেন, আজ পুনরায় নূতন করিয়া জানিয়াছেন। তাহাতে তিনি যত ক্রুদ্ধ না হইলেন, আমি শাসন-কার্য্য আদৌ দেখি না বলিয়া ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি আমাকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারি-স্বরূপ শাসন-কার্য্যভারের কিয়দংশ প্রদান করিয়া ফিরোজাবাদের নূতন প্রাসাদে কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবেন। বিশ্রামের কথাটি একটি অছিলামাত্র,—এই-রূপে তিনি আমাকে রাজকার্য্যে লিপ্ত করিতে চাহেন। আমি তাহাতে অক্ষমতা ও অসম্মতি জানাইয়াছি।” প্রীতা নীরবে স্বামীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বাতায়ন-পথ ভেদ করিয়া আলোকের ধারা কক্ষ প্লাবিত করিতেছিল। কিন্তু পবনের আগমন অতি-মৃদু; তাহার অদৃশ্য পদের শব্দ এত অপরিস্ফুট যে প্রীতার অতিসূক্ষ্ম বসন-প্রান্তটি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল না। হাসান বলিতে লাগিলেন, “বাহমনী-রাজ্যের ভাবী সুলতান হিসাবে পিতৃব্য আমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে

সুলতানের নিশ্চেষ্ট রহিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমীরগণ তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিবেন না। পিতা দীর্ঘজীবী হউন্! কিন্তু তিনি যখন সমাধির শীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে আমীরগণের নেতা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমার পিতৃব্য। তিনি রণোন্মত্ত, যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ। বৃদ্ধ গায়ক সালার যেমন আকাশে বাতাসে সুরের ঢেউ গুণিয়া দিন কাটাইয়া দেয়, পিতৃব্যও সেইরূপ কর্ণে অহর্নিশ অস্ত্রের ঝনঝনা শুনিতে পান। সে-বৎসর আমাদের বিবাহোৎসব আরম্ভ না হইলে, তিনি মালব ও গুর্জ্জরের জয়-কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়া ফিরিতেন না।"

প্রীতা নয়নের সম্মুখে সহসা একটী সুখের চিত্র দেখিল। সে চিত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। স্বামীর শেষের কথাগুলি ঐন্দ্রজালিকের হস্ত-চালিত মোহন দণ্ডের ন্যায় সে চিত্রের বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সে চিত্র বড় সুখের। প্রীতা চেষ্টা করিয়া কথা কহিল; বলিল, "ইহাতে লোকে তোমাকে কাপুরুষ ভাবিবে।"

বায়ুর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্বেত-পক্ষ মেঘের তরণী যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন রবি-করোজ্জল স্বর্ণবর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপর একটী ছায়ার ঢেউ খেলিয়া যায়, নিমিষের জন্য ক্ষেত্রস্থিত শস্যের হেমশোভা ছায়ার অন্তরালে আপনাকে লুকাইত করিয়া ফেলে। পত্নীর বাক্যে হাসানের উজ্জল গৌর মুখমণ্ডলের উপর মুহূর্ত্তের জন্য একটি ছায়া-পাত হইল। হাসান যদি তখন পত্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন প্রীতার আনন অপরাধিনীর ন্যায় মলিন—কক্ষস্থিত ম্লান কুসুমের ন্যায় আভাহীন।......হাসান ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ পৃথিবীতে তিন জনের মতামতের উপর আমার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। পিতা ও পিতৃব্য আমাকে কাপুরুষ ভাবিবেন না। আমি তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছি। আমি এখন মৃগয়া ত্যাগ করিলেও এককালে তাঁহারা শিকারে আমার নৈপুণ্য ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। নেহাল্! তুমি কি আমাকে কাপুরুষ জ্ঞান কর?"

প্রীতা হাসানের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "শাহজাদা! আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।" হাসান পত্নীকে সস্নেহে তুলিয়া বলিলেন, "অপরাধ না করিলে আমার ক্ষমা করার অধিকার কি, নেহাল্? পতির কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকায়িত করিয়া রুদ্ধস্বরে প্রীতা বলিল, "আমি অপরাধিনী।" (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতেরপর)

ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, আরও ভাবিয়া দেখ, যাবতীয় ভূতগ্রাম অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন আবার পর্জ্জন্য হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম ব্রহ্ম

হইতে, এবং ব্রহ্ম অক্ষর পরম পুরুষ হইতে নিঃসৃত। সুতরাং প্রাণ-যজ্ঞেতেই আত্ম-ব্রহ্ম সদা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রবর্ত্তিত চক্র প্রাণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা যিনি আশ্রয় না করেন, তাঁহার জীবন প্রভৃতি সকলই বৃথা। এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই জনক ঋষি পরম সিদ্ধি-রূপ মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রাণযজ্ঞরূপ ক্রিয়াযোগ যিনি আশ্রয় করেন্ তাঁহার আর অপর কোনই কর্ত্তব্য থাকে না। ইহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়।

তা ছাড়া দেখ, এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। তথাপি আমি এই ক্রিয়াযোগ বা প্রাণযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেন না, মহাজনেরা যাহা করিয়া থাকেন্, সাধারণ লোক তাহারই অনুসরণ করে। আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমার দৃষ্টান্তে সকলেই ঐরূপ করিবে; সুতরাং ক্রমে জগৎ উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

আরও একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতির যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ আছে, জগতে সকল কার্য্য তাহারাই করিতেছে। স্বল্প-বুদ্ধিহীন লোকেরা মনে করে যে তাহারা কার্য্য করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুণই গুণে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সুতরাং, জ্ঞানীরা ইহার রহস্য বুঝিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না। তাঁহাদের মতে অনধিকারী অবস্থায় অজ্ঞদিগকে এ রহস্য বুঝাইতে গিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহারা দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারিবে না এবং তাহাদের যথার্থরূপ ধারণাও হইবে না।

পরন্তু সকল কার্য্যই আমাতে সমর্পণ করিবে অর্থাৎ আমিই যে তাহার মূল ইহা সদা জ্ঞান করিবে। যাঁহারা এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহারাই মুক্ত হন; আর যাহারা তাহা না করে তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়াই জানিবে। সকলেই প্রকৃত পক্ষে আপন আপন স্বভাবানুসারেই কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। ইন্দ্রিয়-সকল এবং বাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুনিচয় এরূপভাবে স্বভাবেই নিবদ্ধ যে কোন ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে রাগ-দ্বেষ সদাই তাহার প্রতিপক্ষরূপে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং সহজেই কখন ইন্দ্রিয়ের তদ্বিষয়ের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইতেছে এবং কখনও দ্বেষের উদয় হইতেছে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্য-শরীরে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্ম—এই দুইটী জিনিষ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পর-ধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মই নিজের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিলেও তাহা ভয়াবহ হয়। কারণ, তাহাতে বিষয়াসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের ভাবী জন্ম উৎপাদিত করে, মোক্ষরূপ শান্তি হয় না। আর প্রাণযজ্ঞ-রূপ ক্রিয়াযোগই আত্মধর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং আত্মধর্ম্মই অতি কল্যাণকর। সর্ব্বদা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা উচিত।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে করুণানিধান শ্রীকৃষ্ণ, মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে সে যেন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বলপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া থাকে। এ উত্তেজক কে?" ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন,

"অর্জ্জুন, মানব-শরীরে কাম ও ক্রোধ-নামক দুইটি ভয়ানক জিনিষ আছে। তাহারাই মানুষের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্ত মানুষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পাপ কার্য্য করিয়া ফেলে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ এই কাম ও ক্রোধ-দ্বারা মানুষের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, সৎপথে ও সদ্গতির দিকে অগ্রসর হইতে পায় না। অতএব ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া মনের এই কাম ও ক্রোধ দমিত করিয়া ইন্দ্রিয়-নিচয়কে সুনিয়মে রাখ, তোমার সকল কল্যাণই সাধিত হইবে। দেখ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে সেই চৈতন্য-রূপ পরম পুরুষই শ্রেষ্ঠ শান্তি-নিকেতন। অতএব কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া তদভিমুখেই অগ্রসর হইতে থাক, নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিবে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানপ্রাপক ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত মনের মল অপসারিত হইয়া তাহা সুপ্রকাশিত হয় না; সুতরাং মুক্তিও হয় না। তাই এই কর্ম্মযোগ-নামক তৃতীয় অধ্যায়ও উপদেশ প্রদান করিলেন। সাধককে অগ্রে ইহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্বশ্রূ ও বধূ।

আমাদের দেশের সংসার-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে অতিশয় অল্পসংখ্যক সংসারেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত অশান্তি বিদ্যমান নাই। এই অশান্তির কারণ যে কেবলমাত্র বধূ বা কেবলমাত্র শ্বশ্রূ, তাহা বোধ হয় না। কারণ, উভয়েরই কিছু না কিছু দোষ পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিসংবাদ-স্থলে কেবল একজনের যদি দোষ থাকে, এবং অপর জন যদি ক্ষমাশীল হয়, তবে বিসংবাদ ঘটিতে পারে না। সেইজন্য উভয়েরই দোষ বুঝিতে হইবে। তবে কোন স্থলে হয় ত বধূর অধিক দোষ, শ্বশ্রূর দোষ অল্প, আবার কোন-স্থলে হয় ত শ্বশ্রূর দোষ অধিক, বধূর দোষ অল্প।

প্রথমতঃ, বধূগণের কি কি দোষে শ্বশ্রূ-গণের সহিত বিসংবাদ ঘটিয়া সংসারে অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি প্রধানভাবে দেখা যায়।

১। বধূগণের অবিনয় বা ঔদ্ধত্য। উদ্ধত বধূগণ স্বামীর উপার্জ্জন-হেতু আপনা-দিগকে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী মনে করিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূদিগকে সংসারের গলগ্রহস্বরূপ সামান্ত পরিজনরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে না; এবং এই জন্ত নিজে গৃহিণীর মত বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে দিবারাত্র সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত করাইয়া থাকে।

২। বধূগণের স্বার্থপরায়ণতা। স্বার্থ-পরায়ণা বধূরা শ্বশ্রূ প্রভৃতি অন্য পরিজনবর্গকে স্বামীর উপার্জ্জনের অংশভাগী দেখিতে চাহে না। এইজন্য বৃদ্ধা শ্বশ্রূ বাঁচুন্ কি মরুন্,

ইহা না ভাবিয়া, সে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়াও নিজের স্বামী ও সন্তানগুলিকে লইয়া পৃথক্-ভাবে বাস করিতে ভালবাসে।

৩। সংসারের অশান্তির কারণ-হিসাবে বধূগণের ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা প্রধানরূপে গণ্য হইলেও তাহাদের মুখরতা, নির্লজ্জতা, লোভ, কুটিলতা, আলস্য, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অন্যান্য দোষ-সকলও আনুষঙ্গিকভাবে শ্বশ্রূ ও বধূঘটিত মনোমালিন্যের কারণ হইয়া থাকে। কারণ, বধূগণের ঐ দোষগুলি সংসার শান্তির অনুপযোগী হওয়ায় কখনও লোকতঃ কখনও বা ধর্ম্মতঃ শ্বশ্রূগণের চিত্তে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলে পরস্পর কলহজনিত অশান্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া পড়ে। যেমন, নির্লজ্জা বধূ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলেন ; তাহাতে শ্বশ্রূ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। বধূ উদ্ধতভাবে তাঁহার কথা ত শুনিলেনই না, বরং মুখরতাবশতঃ শ্বশ্রূর তিরস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ফলে উভয়ের কলহ হইল। লোভপরায়ণা বধূ সংসারের উত্তম আহার্য্য দ্রব্যের অংশ কাহাকেও না দিয়া, নিজে লুকাইয়া লুকাইয়া খাইতে লাগিলেন। শ্বশ্রূ তিরস্কার করিতে গেলে, অসহিষ্ণু বধূ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখরতা অবলম্বন করিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-দাবানল প্রজ্বলিত হইল ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক্, শ্বশ্রূগণ কিরূপে বধূদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং অশান্তির কারণ হইতে পারেন্।

১। শ্বশ্রূগণের বধূদিগের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণতা। অনেক শ্বশ্রূ মনে মনে আশা করেন যে, তাঁহারা যখন দশমাস দশদিন জঠরে ধরিয়া প্রাণপণে যত্ন করিয়া পুত্রগণকে পালন করিয়াছেন, তখন তাঁহারাই একমাত্র পুত্র-দিগের সকল স্নেহের অধিকারিণী ; সেই স্নেহের অংশীদার অন্য কেহই হইতে পারে না। তাঁহা-দের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে এই হয়, যে যখন পুত্রগণ নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীকে প্রাণসমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন্, তখন সমগ্র পুত্রস্নেহাকাঙ্ক্ষিণী জননীর মনে বধূর প্রতি একটা ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহারা নানা উপায়ে বধূদিগের প্রতি নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন।

২। শ্বশ্রূগণের অসহিষ্ণুতা। বধূগণ যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা পরকন্যামাত্র। শ্বশুর-বাটীর প্রতি তখন তাহাদের কোনরূপ আকর্ষণ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সেই পরের কন্যাকে নিজের করিতে হইলে কতদূর সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ! বিশেষতঃ বধূগণ যখন অপর ব্যক্তিগণের দুহিতা, এবং অপর স্থানে প্রতিপালিতা, তখন পিতৃগৃহে প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারেই তাহাদিগের চরিত্রসংগঠন হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের চরিত্রের উপাদানগুলি শ্বশুরবাটীস্থ ব্যক্তি-গণের চরিত্রোপাদানগুলির সহিত একরূপ হইতে পারে না। কাজে-কাজেই, বধূগণ যে শ্বশুর-বাটীতে আসিয়াই একেবারে শ্বশুর-বাটীর অনুরূপা হইতে পারিবে, তাহা আশা করাই অনুচিত। যতদিন না বধূগণ সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ধাতুর অনুরূপা হয়, ততদিন শ্বশ্রূদিগের সহিষ্ণুতা-অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা-দিগকে স্বপথে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি শ্বশ্রূগণ সেটুকু সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করিয়া বধূ-

দিগের প্রতি একটা অন্যায় জোর করিতে যান, তাহা হইলে বধূগণের শ্বশ্রূদিগের প্রতি বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে পরস্পরমধ্যে বিবাদ সুনিশ্চিত। মনে করুন, কোন বধূ একজন পদস্থ ব্যক্তির কন্যা হওয়ায় পিত্রালয়ে তেমন সংসারের কাজকর্ম শিক্ষা করে নাই; কিন্তু সে এমন এক গৃহস্থ শ্বশুরের বাটীতে পড়িল, যেখানে সংসারের সমুদয় কাজকর্ম নিজেদেরই করিতে হয়। সে অবস্থায় শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য পরম-সহিষ্ণুতা-সহকারে তাহাকে একটু একটু করিয়া কর্ম্মপথে আনয়ন করা। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া যদি একেবারেই তাহাকে কর্ম্মনিপুণা দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে বধূর চরিত্র আবাল্য কর্ম্মের বিরুদ্ধপথে চালিত হওয়ায়, তাঁহার সে অভিলাষ ব্যর্থ ত হইয়াই থাকে, এতদ্ব্যতীত তাঁহার বধূকে সত্বর কর্ম্ম-নিপুণা দেখিবার যে প্রচেষ্টা, তাহা বধূর পক্ষে নির্য্যাতনস্বরূপ হওয়ায় নির্য্যাতিত বধূর শ্বশ্রূর প্রতি একটা বিদ্রোহ-সঞ্চার ঘটিতে পারে, এবং সেই বিদ্রোহ সংসারে নানারূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

৩। শ্বশ্রূগণের নির্দ্দয়তা। শ্বশ্রূগণ যদি দয়াহীন হন্, তাহা হইলেও পরদুহিতা বধূ-দিগকে আপনার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, নির্দ্দয়া শ্বশ্রূ বধূগণের প্রতি স্বকন্যোচিত মধুর ব্যবহার না করিয়া যদি প্রতিপদেই তাহাদিগের প্রতি রূক্ষ আচরণ করিতে যান, তাহা হইলে তাহারা শ্বশ্রূর বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না; বরং নির্য্যাতনের ফলে বধূগণের চিত্ত এত বিকৃত হইয়া পড়ে যে তাহারা অবশেষে প্রকাশ্যভাবেই শ্বশ্রূর সহিত বিবাদ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কুচিতা হয় না। এতদ্ভিন্ন, শ্বশুর-শ্বশ্রূ যেরূপ নির্ম্মমতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক কন্যার পিতাকে নষ্টসর্ব্বস্ব করিয়া বধূকে ঘরে আনয়ন করেন, তাহাতেও স্বকীয় জনকজননীর উৎপীড়কের সংসারে বধূদিগের একটা মমতাবুদ্ধি সহজে আগমন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর অনেক শ্বশ্রূ বধূদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াও তাহা-দিগকে যে উপায়ে আপনার করিয়া লইতে হয়, তাহা করেন না। অর্থাৎ পরের কন্যা বলিয়া মমতাহীনভাবে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল নির্ম্মমহৃদয় শ্বশ্রূগণ নিজের পুত্রকে বা নিজের কন্যাকে যে-ভাবে দর্শন করেন, পরদুহিতা বধূকে সে-ভাবে দর্শন করেন না। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তাহা নহে; কিন্তু পরের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই কারণে দেখা যায় যে, সংসারের যত উত্তম উত্তম উপভোগ্য দ্রব্য তাহা তাঁহারা নিজ পুত্র বা কন্যাদিগকে দিয়া, বধূদিগকে ক্রীতদাসী মনে করিয়া সেই সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। শ্বশ্রূ-কর্ত্তৃক এইরূপ নির্ম্মমভাবে দৃষ্ট হইয়া কোন বধূরই শ্বশ্রূর প্রতি মমত্বমূলক জননীজ্ঞান আসিতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা মনো-মালিন্য থাকায় প্রতিপদেই পরস্পর কলহ-জনিত অশান্তি ঘটিতে পারে। শ্বশ্রূদিগের এই নির্ম্মমতার সহিত যদি আবার স্বার্থপরতা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। স্বার্থ-পরায়ণা শ্বশ্রূ বধূ-জনকের নিকট প্রভূত পণ-গ্রহণে নিজপুত্রকে বিক্রয় করিয়া স্বকীয় স্বার্থসাধনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হয়েন না; বধূকে আনয়ন করিবার পরও তাহার হতভাগ্য

জনকজননীর নিকট হইতে নানা প্রকারে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। "আজ অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "কাল অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "তোমাদের কন্যার অসুখ হইয়াছে, তোমরা চিকিৎসার ভার গ্রহণ কর," "তোমাদের জামাতার অসুখ হইয়াছে, তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়া যাও," "তোমাদের কন্যা পূর্ণগর্ভা, অতএব তাহাকে বাটীতে লইয়া প্রসবের বন্দোবস্ত কর" ইত্যাদি প্রকার স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য শ্বশ্রূ বৈবাহিক-দম্পতির উপর জুলুম করিয়া থাকেন। আর বৈবাহিক-দম্পতি যদি অবস্থার প্রতিকূলতা-হেতু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারেন, স্বার্থনিষ্ঠা শ্বশ্রূ তখন বধূর মা-বাপের 'খোঁটা' দিয়া অনবরতই তাহার সহিত নির্ম্মমভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ; কখনও কখনও বা নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে বধূ কদাচই শ্বশ্রূকে স্বকীয় জননীরূপে সম্মান করিতে চাহে না। বরং শ্বশ্রূর কদাচরণে তাহার হৃদয়ে যে একটু একটু বিদ্রোহধূম জ্বলিতে থাকে অবসর প্রাপ্ত হইলে সেই ধূম অতিভীষণ বিবাদানলে পর্য্যবসিত হয়।

আরও দেখা যায়, এই স্বার্থপরায়ণ শ্বশ্রূগণ তিন চারি পুত্রের জননী হইলে, যে পুত্র অধিক উপার্জ্জন করে তাহারই নিকট স্বার্থসিদ্ধির অধিক সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার ও তাঁহার পত্নীর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এমন কি, যে বধূ ধনী লোকের কন্যা, তাহার পিত্রালয় হইতে ভারে ভারে জিনিষপত্র আসে বলিয়া তাহার প্রতি তিনি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; আর যে সকল পুত্র স্বল্পোপার্জ্জক বা মৃত, তাহাদের পত্নীদিগের প্রতি অথবা দরিদ্র-দুহিতা পুত্রবধূদিগের প্রতি অল্প স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই স্নেহ-তারতম্যে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মনে পরস্পর এমন একটা ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে যে, সংসারে অশান্তির সীমা থাকে না।

কখন কখন শুধু যে স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির প্রেরণায় শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূগণের প্রতি স্নেহ-তারতম্য প্রদর্শন করেন, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রকৃতিগত পক্ষ-পাতিত্ব দোষ থাকায় তাঁহারা পাঁচটার মধ্যে সকলকে সমানভাবে স্নেহ করিতে পারেন না। ফলে, তাহাতেও স্নেহ-তারতম্য-বশতঃ সংসারে শান্তি থাকে না।

৪। শ্বশ্রূগণের গাম্ভীর্য্যের অভাব। অনেক শ্বশ্রূর স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্য না থাকায় তাঁহারা পুত্রবধূদিগের উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না, এবং নিজের অক্ষমতার বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল বধূদিগের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সংসার অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। *

এইরূপে শ্বশ্রূ ও বধূদিগের চরিত্র সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, যে শুধু বধূ-

---

* নারীগণ পুরুষ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া থাকেন, নারীগণ এই কথার সমর্থন করিয়া অনেক প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন। কিন্তু শ্বশ্রূ-কর্ত্তৃক বধূর নানা প্রকার উৎপীড়নের কথা হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের তথাকথিত উৎপীড়নের কারণ অধিকাংশ-স্থলে তাঁহাদেরই স্বজাতি। সংসারে আরও একটা দৃশ্য দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, যে যখন সংসারে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কন্যার স্বজাতীয় নারীগণই তখন সবিশেষ দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। অথচ পুত্র জন্মাইলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। লেঃ

দিগের নহে, শ্বশ্রূদিগের দোষেও সংসারে অশান্তি আসিতে পারে। বিশেষতঃ বধূজীবন ও শ্বশ্রূ-জীবন যখন একই নারী-জীবনের অবস্থান্তরমাত্র, তখন বধূ-অবস্থায় নারীগণের যে দোষ থাকে, শ্বশ্রূ-অবস্থায় সেই সেই দোষগুলি অবশ্যই সংক্রমিত হইতে পারে। এই জন্য যে নারী বধূ-অবস্থায় নিন্দিতা হয়, সে কখনও শ্বশ্রূ-অবস্থায় প্রশংসিতা হইতে পারে না। এবং যে নারী বধূ অবস্থায় শ্বশ্রূর সহিত কলহদ্বারা সংসারের অশান্তিকারিণী বলিয়া নিন্দিতা হয়, সে শ্বশ্রূ-অবস্থাও যে বধূর সহিত কলহদ্বারা সংসারে অশান্তি উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন অনেকস্থলে দেখা যায় যে, বধূ-কর্ত্তৃক শ্বশ্রূনির্য্যাতন শ্বশ্রূকৃত পূর্ব্ব নির্য্যাতনের প্রাপ্তাবসর প্রতিশোধমাত্র। অতএব সংসারের শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সকল অশান্তি দূরীকৃত করার একমাত্র উপায় নারীগণের চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন। যাহাতে নারীগণের হৃদয়ে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যাহাতে তাহাদের চিত্ত স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, মমতা প্রভৃতি কোমল গুণের অধিকারী হয়, যাহাতে তাহারা লৌকিক ব্যবহারে সর্ব্বতো-ভাবে নিপুণা হয়, যাহাতে নিঃস্বার্থতা দ্বারা তাহারা অপরকে আপনার করিয়া লইতে পারে,—এইরূপ শিক্ষা-দ্বারা শৈশব হইতেই তাহাদের জীবন গঠিত করিতে পারিলেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সাংসারিক অশান্তির বিলোপ হইতে পারে।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

শিমলা-শৈলে।

(পথে)

অনেক দিন হ'তে দাদার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াব, এই ইচ্ছাটা বড়ই বলবতী ছিল। বিধির বিড়ম্বনায় তা'তে দু' বৎসর ধরে বাধা পড়ে আস্‌ছিল। যা'হোক্ এবার পূজার বাজনার ভেতর দিয়ে সপ্তমী-পূজার দিন বেরিয়ে পড়্‌লাম্। মনে খুব আনন্দ, খুব আশা! কারণ, ছেলেবেলা থেকে শিম্‌লা-পাহাড়ের গল্প শুনে শুনে বোধ হ'তো, এই বাংলা-দেশ আর শিম্‌লা এক পৃথিবীতে নয়;—সেখানকার আকাশ বাতাস সবই বুঝি নূতন রকমের!

পূজার লম্বা ছুটী পেয়ে রেলের বাবুরা সব দলে দলে এ-দিক্ ও-দিক্ যা'চ্ছেন্। তবে অনেকের গন্তব্য স্থান 'মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ্'—বারাণসী-ধাম অবধি। ভিড় ভোগ কর্‌তে কর্‌তে সবুজ শস্যক্ষেত্র, পুকুর আর মাঠের মনোরম দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বাংলা-দেশ পেছনে রেখে ক্রমে ক্রমে সাঁওতাল-পরগনাস্থিত মিহিজাম, জামতাড়া, কার্ম্মাটার ও মধুর মধুপুরে এসে পড়্‌লাম। দিনের আলো সবেমাত্র গিয়েছে। রেললাইনের দু'ধারে বাড়ী আর বাগানগুলি ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। শরতের সুন্দর তারকা-শোভিত নীল আকাশতলে ফুরফুরে বাতাসের মধ্যে দিয়ে আমরা সুদূর পথের যাত্রী! কি এক অভিনব আনন্দে মনটা ভরে উঠ্‌ব।

মনে মনে গাইতে লাগলাম্ ;—"প্রণমি তোমারে নাথ, চলেছি সুদূর পথে।" মনে ভাব আসলেও গাড়ীর ভেতর বাবুদের মজাদারী গল্প এবং টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে তা ডুবে যাচ্ছিল। দাদা অনেক কষ্টে হুকো-কল্‌কে নিয়ে বসেছেন দেখে খুব আনন্দ হলো ; কারণ, ছেলে-ছোক্‌রার দল আমোদে কাটাচ্ছি ; আর তিনি চুপ করে বসে থাক্‌বেন!

সকালবেলা যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি, চারিদিকে বেশ আলো ফুটে উঠেছে। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী মোগলসরাইতে এলো। বারাণসী-দর্শন-মানসে বহু যাত্রী এখানে নেমে গেল। কাশীর গাড়ী ধরবার জন্যে যে-রকম আগ্রহ দেখ্‌লাম, জানি না, প্রাণের মাঝে প্রকৃত ধর্ম্মের জন্যে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে কি না! পবিত্র-সলিলা বরুণা ও অসীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্যনগরী বারাণসী যা' রোমানদের রোম, মুসলমানদের মক্কা অপেক্ষা হিন্দুদের অধিকতর পবিত্র, তা'তে আজ কালের গতিতে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে! আছে কেবল পূর্ব্বস্মৃতির ক্ষীণ রেখামাত্র। বারাণসীর নবীন-প্রাচীন অবস্থা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চুনার এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণী পশ্চাতে রেখে আমরা একেবারে—"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে"র উপর আসিয়া উপস্থিত হ'লাম।

দূর কেল্লার এবং গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখে উল্লাসে মনঃপ্রাণ নেচে উঠ্‌ল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের পরে রামচন্দ্র পুষ্পকারোহণে স্বদেশে ফিরবার সময়ে পবিত্র-পুরী প্রয়াগে উপস্থিত হয়ে এই নদী-সঙ্গম দেখে ভাবে বিহ্বলচিত্তে রমণী-কুল-শিরোমণি সীতা-দেবীকে যা' বলেছিলেন্, অমর কবির লিপিবদ্ধ সেই কথা মনে হলো—

'ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী-
যষ্টিরিবানুবিদ্ধা···
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা
যমুনাতরঙ্গৈঃ।...অর্থাৎ

"সুনীল যমুনা-জলে মিলি কুতূহলে,
বহিছেন এই শ্বেত সুর-তরঙ্গিনী—
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীল-মণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিংবা নীল-উৎপলে।

মানসের হংসরাজি ধবলবরণ।
নীল হংসদলে যেন হয়েছে মিলিত,
ভূতলে বিচিত্র শ্বেত চন্দন-রচনা
শোভে যেন কৃষ্ণপত্রে অগুরু-অঙ্কিত।

কোথাও চিত্রিত হয়ে ধবল জ্যোৎস্নায়
শোভে যেন ছায়া-লীন তিমির-পটল;
অথবা শরদে শুভ্র বারিদ-মালায়
ভেদি যেন দেখা যায় নীল নভস্তল!

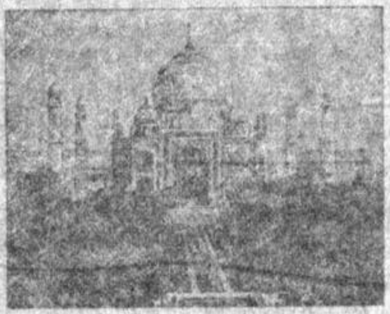
ধবল ভবেশ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণভুজঙ্গে বেষ্টিত—
এ-রূপে কতই রূপ দেখ বরাননে,
ধরেন্ জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে!

এ হেন সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোন জন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার।"

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমরা এলাহবাদে আসলাম। কল্‌কাতা থেকে পূর্ব্বেই আহারাদির জন্য পত্র দিয়েছিলাম। প্লাট্‌ফর্মে নামিয়া ভ্রাতাকে দেখ্‌লাম আর যথেষ্ট খাবারও পেলাম। এলাহাবাদ-প্রবাসী আমাদের সুপরিচিত এক ব্যক্তি মাননীয় দাদাকে প্রাণ-

জরে স্নান করাইয়া দিলেন। তিনি ঠাণ্ডা হ'লেন দেখে আমরাও ঠাণ্ডা হ'লাম। আমরা মোগল-সারাইয়ে ঐ কাজ সেরে নিয়েছিলাম। সেই জন্যে "প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ" করে বেশ আরাম হল। এখনও আমরা এক আফিসের অনেকগুলি মানুষ এক গাড়ীতে চলেছি। আমাদের ফূর্ত্তিতে গাড়ী বেশ গুল্‌জার হয়ে উঠেছে। এমন জমেছে যে কেউ কেউ ভাবে অধীর হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই দুরবস্থার দিনে এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ বড়ই মধুর! * * *

ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাহিরে খুব গোলমাল। গাড়ী পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এক আশ্চর্য্য



তাজমহল।

প্রেমপুরী তাজমহলের রাঙা টুণ্ডলায় এসেছে। ঘুম আর হ'লো না। কিছুক্ষণ পরেই হাৎরাজ-জংসনে আস্‌লাম। বৃন্দাবনের বহু যাত্রীদের দশা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনটা যেন কেমন কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। এই নিশীথ রাত্রিতে কানে যেন আমার সেই-কালের মধুর মুরলীর মধুর ধ্বনি প্রবেশ করল:—"ওগো শোন্ কে বাজায়! বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়।" এইরূপ নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

ভোরবেলা দেখি, গাড়ী স্মৃতির শ্মশান দিল্লী নগরীর মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল। এই



শাহ্‌জাহান্।

সেই প্রেমিক সম্রাট্ শাহজাদের শাজাহান-বাদ! এই সেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ! দিলীপের সাধের দিল্লি! দেহ শিহরিয়া উঠিল! যেখানে কত রাজ্যের উত্থান ও পতনের লীলা হয়ে গিয়েছে, এখনও রাবণের চিতার মত সেই স্মৃতির শ্মশান ধূ-ধূ করে জলছে। ঐ সেই, দূরে নীল যমুনার তটে ঐ কুতব-মীনার,



রিজিয়া।

ঐ রিজিয়ার শ্রীহীন সমাধি-ভবন, ঐ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির, ঐ দিল্লীর ভগ্ন দুর্গ, ঐ পৃথ্বী-রাজের জীর্ণ-মলিন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, ঐ সরলা সুশীলা জাহানারার সরল সমাধি-মন্দির, ঐ চারিদিকে কত শত প্রাসাদের কঙ্কালসার মূর্ত্তি! যে দিকে দেখি সেই দিকেই, "স্মৃতি দিয়ে

ফেরা"। ছয় বৎসর পরে আবার দিল্লি আস্‌লাম। অনেক পুরাতন দুঃখ-স্মৃতির কাহিনী মনে হওয়াতে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল!

ক্রমশঃ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবের বিখ্যাত নগরী অম্বালায় এলাম্‌। অনেক ক্ষণ পরে আমরা গাড়ী হইতে নেমে প্লাটফর্ম্মে বেড়াতে লাগ্‌লাম। কিছু ফল এবং নূতন রকমের পাঞ্জাবী খাবার ক্রয় করে আহার করলাম্‌। অম্বালা ষ্টেসনটী বেশ বড়। এখানে নানা দেশের পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দেখ্‌লাম। সকল পুরুষেরই মাথায় এক একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী। পাগড়ী-ছাড়া পুরুষ নাই বল্‌লেই হয়। ঐ সকল স্ত্রী-পুরুষের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য যে, তা আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

এখান থেকে কাল্‌কা আর ৪০ মাইল। এইবার আমাদের গাড়ী যেন একটু হাপাতে লাগ্‌ল, গাড়ীর গতি ক্রমশঃ মন্দ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ২।১টী ষ্টেশন পার হ'য়ে যাবার পর আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারলাম যে গাড়ী সমতল ভূমি হতে উৎরাইএ উঠ্‌ছে। আর কাল্‌কা পৌঁছিবার আর বেশী দেরী নেই। আমরা সব জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিলাম। দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলি গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে মাথা উঁচু করে অচল অটল হয়ে দাড়িয়ে আছে। কালকার রাস্তা আর ফুরায় না! বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। এখন এক মাইল পথ এক শত মাইল বলে বোধ হতে লাগ্‌লো। অল্পক্ষণ পরেই ই, আই, রেলের শেষ সীমা কাল্‌কাতে এলাম।

দুই দিন পরে মাটিতে পা দিয়ে বাঁচ্‌লাম। জিনিষপত্র "ওয়েটিং রুমে" রেখে আমরা কল্‌কা-সহর বেড়াতে বের হ'লাম। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমরা এক মুদির দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করে একখানি খাটিয়া টেনে বস্‌লাম। দোকানে দু'টী বাঙ্গালী ভদ্রলোকর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আলুর ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে এসেছেন। বাঙ্গালীর এই উদ্যম দেখে মনে বড়ই আনন্দ হলো। শিম্‌লা-পাহাড়ের পাদদেশে এই স্থান। জায়গাটী ছোট হলেও সকল প্রকার দ্রব্যাদি এখানে পাওয়া যায়। একটী বিদ্যালয়ও এখানে আছে। এখান হ'তে শিমলা শৈলের আরম্ভ। চারি দিকে ছোট বড় পাহাড়ের সাজান বাগান। সন্ধ্যার পর হোটেলে ভাত খেয়ে বাঙ্গালীর প্রাণ ঠাণ্ডা করলাম। পরদিন প্রভাতে বহু-কাল-বাঞ্ছিত ছবির দেশে যাত্রা কর্ব্ব, এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীচণ্ডীচরণ দে।

আত্মার।

ক্ষুদ্র বালুকণা আর সৌরজগতের
　সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি মূলাধার,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগুলি তোমারি চরণ
　প্রদক্ষিণ করে বার বার।

ফুল ঝরে, পাতা খসে, নদী বয়ে যায়,
　হেরি তথা তোমারি স্পন্দন,
অবিচল শিখরের মরমে মরমে
　চেতনা জাগাও অনুক্ষণ।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে সাজানো কেমন
ভাবিতে বিস্ময় লাগে মম,
কেমনে করিলে আত্ম-প্রকাশ জগতে,
হে আমার চির-প্রিয়তম!

কিছু অনুভূতি নাই, কিছুই বুঝি না,
সৃষ্টিতত্ত্ব হয় নাই শেখা,
বিশ্বের দেবতা নও, হে মঙ্গলময়,
তুমি মাত্র আমারই একা!

এত বড় জগতের রচয়িতা তুমি,
সেই তুমি আমার দেবতা,—
সকল সময়ে আমি এই কথাটিরে
ভাবিতেও মনে পাই ব্যথা!

আর কিছু নাই প্রভো, তুমিই আমার,
চিরকাল তোমারই আমি,
তোমারি চরণ-পদ্ম হৃদয়-মৃণালে
যুগে যুগে ফুটাইব স্বামী!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

মীরাবাই।

যিনি চিতোরের রাজপুত্রবধূ—ভবিষ্যতে চিতোরের রাজমহিষী হইবেন, রাজপুতানার মধ্যে রূপে গুণে অদ্বিতীয়া দেখিয়াই মহারাণা তদ্গুণযুক্তা রাঠোর-কুলোদ্ভবা মীরাবাইর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজপুত্রকেও তিনি চিতোরের সিংহাসনের উপযুক্ত করিবার জন্য সকল বিদ্যায় বিশারদ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ মীরা দুইজনেই কবি। যৌবনের প্রথম উন্মেষে, মনোমত জীবন-সহচর-সহচরীর মিলনে দুইজনেরই হৃদয়ের প্রেম-প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা দুইজনেই হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই কবিতা-রচনায় কাটাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃই তাঁহাদের কবিতায় ভাবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী মীরার রূপে মুগ্ধ! তাঁহার কবিতা-সকল পার্থিব রূপ ও সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তনেই বিকাশ পাইতে লাগিল। অপরদিকে উদারহৃদয়া মীরা শ্রীভগবানের জীবনী-পাঠে ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধা; তাঁহার কবিতা-সকল ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রূপ-ব্যাখ্যানে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃই অনুভব করিতে লাগিলেন, সেই বিশ্বপ্রেমিক ভগবানের ভালবাসা ব্যতীত জীবনে সুখ নাই; এবং তাঁহার সকল কবিতাই সেই হরি-প্রেমের গুণগানে পূর্ণ হইতে লাগিল।

কালে রাজপুত্র চিতোরের রাজ-সিংহাসনে মহারাণা-রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। মীরা মহারাজ্ঞী, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের অর্দ্ধেক ভার তাঁহার উপর। তিনি এক্ষণে স্বাধীনা, পূর্ব্বের ন্যায় রাজবধূ নহেন। মহারাণাও তাঁহাকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, যাহাতে মীরা স্বাধীন-ভাবে তাঁহার প্রিয় কাব্যের অনুশীলন করিতে পারেন।

ধর্ম্মে অনুরাগ, ভগবানে ভালবাসা ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ক্রমশঃ মীরাকে সংসার হইতে দূরে লইয়া যাইতে চাহিল।

তিনি গৃহকৰ্ম্ম, দেশ-পারিপাট্য, প্রভৃতি সাংসারিক ব্যাপার ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাঁহার সহচরীদিগের সহিত তিনি ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন অদৃশ্য ভগবান্‌কে দৃশ্যভাবে বেষ্টন করিয়া নিজেরা গোপিনীভাবে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে জগৎসংসার ভুলিয়া যাইতেন।

প্রগাঢ় প্রেম-প্রবুদ্ধ মীরার সরস কবিতা-সকল তাঁহার সুললিতকণ্ঠে গীত হইয়া সকলের প্রাণকে মুগ্ধ করিত। একবার যে তাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভজন শুনিত, সেই বিমুগ্ধ হইত। কিন্তু কতদিন এই বিশ্বপ্রেমিকা রাজভবনের প্রাচীর-বেষ্টনে আবদ্ধ থাকিতে পারেন! তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাইয়া স্খলিত-কণ্ঠে আপনা ভুলিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। যিনিই তাঁহার গান শুনিতেন, তাঁহারই হৃদয় বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত হইত। ক্রমে ক্রমে দশ, শত, সহস্র নরনারী তাঁহার হরিগুণগান শুনিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে সমবেত হইতে লাগিল। মীরা ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া যেখানে তাঁহার হৃদয়ের দেবতা অধিষ্ঠিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটাইতে লাগিলেন। মীরার নাম ও তাঁহার কবিতার যশোমহিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, নর-নারী সকলের মুখে কেবল মীরা-রচিত গীতাবলীই গীত হইতেছে, শুনা যাইত।

দিল্লীর বাদশাহের নিকটও এই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী চিতোর-মহারাণীর গভীর কবিত্ব-মহিম-কাহিনী উপস্থিত হইল। বাদ্‌শাহ্‌, আপনি কবি, তাঁহার রাজসভা সর্ব্ববিধ কাব্য, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের আকর। তিনি নিজে কবিত্বের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। রমণীর এই কবিত্ব-কাহিনী শুনা পর্য্যন্ত বাদশাহ্‌ রচয়িত্রীর দর্শন-লাভ ও তাঁহার সুকণ্ঠে গীত ভগবৎ-গুণকীর্ত্তন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

যদিও চিতোর তখনও পর্য্যন্ত বাদ্‌শাহের অধীনতা স্বীকার করে নাই, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন শত্রুতার ভাব ছিল না। কিন্তু বাদ্‌শাহ্‌ হিন্দুর মর্য্যাদা বুঝিতেন, সেইজন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে মীরার দর্শনাভিলাষ ব্যক্ত করিয়া আর এক রাজপুত-যুদ্ধের অবতারণা করিতে সাহস করিলেন না। মীরা যে কেবল একটী সাম্রাজ্যের মহারাণী তাহা নয়, তিনি শুদ্ধাচারিণী হিন্দু রমণী। বাদ্‌শাহ্‌ জানিতেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বাদ্‌শাহ্‌ চিতোরের এক রাজ্ঞীর রূপদর্শন-কামনা করায় চিতোরের সকল রাজপুত সে অপমান সহ্য করার পরিবর্ত্তে, শেষ ব্যক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিল ও রাজপ্রাসাদের সকল মহিলাই বিধর্ম্মীর স্পর্শ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বেচ্ছায় অগ্নিদেবকে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল।

অবশেষে বাদ্‌শাহ্‌ তাঁহার সঙ্গীতাচার্য্যের শরণাগত হইলেন এবং স্থিরীকৃত হইল যে দুইজনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে মীরার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার গান শুনিবেন। তাঁহারা দুইজনে কোন সহায় না লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বাদ্‌শাহ্‌ স্বচক্ষে সেই অসামান্য-রূপবতী মীরাকে দেখিলেন ও স্বকর্ণে তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন। তিনি সেই ভজন

শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া, মীরার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন ও মুক্তির উপায় তাঁহাকে শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মীরার রূপের জ্যোতিঃ বাদশাহ্‌কে বিভোর করিয়া তুলিল, তাঁহার নয়নের সৌন্দর্য্য, সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরকের ন্যায় তাঁহার মনোহর দৃষ্টি বাদশাহকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি নিজ ছিন্ন ছদ্মবেশের ভিতর হইতে একটী মহামূল্য রত্নহার বাহির করিয়া বলিলেন, "দেবি, দাসের ভক্তিচিহ্নস্বরূপ এই সামান্য উপহার আপনার মন্দিরের দেবতার জন্য গ্রহণ করুন।"

মীরা সেই রত্নহার হস্তে লইয়া ছদ্মবেশী বাদশাহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী! এই রত্নহার মহামূল্য ; জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ছিন্নকন্থ সন্ন্যাসী এই মহামূল্য হার কোথায় পাইলেন?" বাদশাহ্ উত্তর করিলেন, "স্নান করিবার সময় যমুনায় আমি ইহা পাইয়াছি। আপনাকে ও আপনার মন্দিরের দেবতাকে এই মহামূল্য রত্নহার উপহার দেওয়া ব্যতীত ইহার কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে, জানি না।"

মীরা তাঁহাদের উভয়কে তাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বাদশাহ্ ও সঙ্গীতাচার্য্য দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এই রত্নহার স্বাধ্বী মীরার সংসার-সুখ ও তাঁহার স্বামীর ভালবাসার অন্তরায় হইল। এই মহামূল্য রত্নহারের বিবরণ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণমূর্ত্তির উপর শোভিত এই মহামূল্য রত্নহার দেখিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শক প্রতিদিন মন্দিরে সমবেত হইতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে একজন চিনিতে পারিলেন যে এই রত্নহার তিনি বাদশাহ্‌কে বহু লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিদ্বয়ের পরিচয় গুপ্ত রহিল না। মহারাণা শুনিলেন, মুসলমান-বাদশাহ্ তাঁহার পত্নীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছেন ও তাঁহাকে মহামূল্য রত্নহার উপহার দিয়াছেন। ইহাতে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার সম্মানের হানি হইয়াছে, মীবারের বংশের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে এবং বিধর্ম্মীর স্পর্শে পত্নীও অস্পৃশ্যা হইয়াছেন। রাণীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তখনই প্রচারিত হইল, কিন্তু সে আজ্ঞা পালন করিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মহারাণা রাজ্ঞীর উপরই তাঁহার নিজ জীবন শেষ করিবার আজ্ঞা স্বাক্ষরিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

যখন মীরাবাই তাঁহার দৈনিক ঈশ্বরারাধনার পর মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে সেই আজ্ঞাপত্র তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল। আজ্ঞা পড়িয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত একবার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন কি না? কিন্তু আজ্ঞাবাহক উত্তর করিলেন যে মহারাণা আর তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না, এই তাঁহার আদেশ। মীরা, বলিলেন, "স্বামীর আজ্ঞা হিন্দুরমণীর শিরোধার্য্য।

মীরাবাই সর্ব্বদাই বহুভক্ত-পরিবেষ্টিতা থাকিতেন। এই কঠোর রাজাজ্ঞা তাঁহার ভক্তবৃন্দের মনে কি উত্তেজনা ও বেদনার সৃষ্টি করিবে বুঝিতে পারিয়া এ-বিষয় তিনি

তাহাদের নিকট বিন্দুমাত্র ব্যক্ত করিলেন না ; নিঃশব্দে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া একখানি পুরাতন গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুষুপ্ত রাত্রিতে যখন সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তখন তিনি সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিলেন।

উপরে নীলাম্বর আকাশ-গাত্রে রত্নখচিত তারকামালা শোভা পাইতেছে। মীরা যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনীরে প্রতিবিম্বিত সেই শোভা কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার হরির আরাধনায় মগ্ন হইলেন, প্রার্থনাশেষে নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। জলস্পর্শমাত্র তিনি একটী জ্যোতিঃ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বিকশিত দেখিলেন। তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মীরা ! তুমি তোমার স্বামীর আদেশ পালন করিয়াছ, তুমি রাজাজ্ঞায় নিজকে মৃত্যুগ্রাসে নিঃক্ষেপ করিয়াছ। কিন্তু তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য যে এখনও বাকি রহিয়াছে। সেই উচ্চ কর্ত্তব্য তোমাকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। উঠ, জগৎকে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দাও।"

মীরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত এবং তিনি নদীতীরে উন্মুক্ত সূর্য্যালোকে শায়িত। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের বাণী স্মরণ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও পরে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে সেই নদীতীরবর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কয়েকটি রাখাল বালককে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমরা বলিতে পার কি সেই মহাতীর্থ বৃন্দাবন কতদূরে ?"

তাঁহার মধুর-বাক্য-শ্রবণে রাখাল বালকেরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাহারা তাঁহাকে গোদুগ্ধ পান করাইল ও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তিনি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের সহিত চলিতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন, সেই পথেই তাঁহার অসামান্য রূপমাধুর্য্য ও সুকণ্ঠ-গীত সুললিত সঙ্গীত যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গের অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, নরনারী সকলেই নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গীতে যোগদান করিতে করিতে ধাবিত হইল। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে নানা-প্রকার ভক্তিউপহার, সযত্নে প্রস্তুত খাদ্যাদি প্রদান করিতে আসিল। তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না ; সকলকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। যখন তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বয়ং উমা কৈলাস-পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সকল সহচরীসমভিব্যবহারে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

বৃন্দাবনে তাঁহার আবির্ভাব-সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার রচিত গীতাবলি মুখে মুখে গীত হইতে লাগিল। চিতোরে যাহারা তাঁহাকে ভক্তি-ভালবাসায় পূজা করিত, সকলেই এবার আসিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইল। যাহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই, তাহারা এই সুযোগে দর্শনেচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইল। তিনি এখন

মিবারের সমৃদ্ধিশালিনী মহারাণী নহেন, এখন তিনি সামান্য গৈরিক-বেশধারিণী ভিক্ষু-রমণী। কিন্তু ভিক্ষাপাত্র-হস্তে তিনি এখন মেবারে অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারিণী। উহা প্রেমের সাম্রাজ্য, যাহা মানবকে মুক্তি ও শান্তিদান করিতে পারে।

সেই সময় বৃন্দাবনে এক বৃদ্ধ গোস্বামীর অধিষ্ঠান। পাণ্ডিত্য ও গভীর সাধনায় তাঁহার সমতুল কেহই ছিল না। কামিনী ও কাঞ্চন জগতে অনিষ্টের মূল ও মুক্তিপথের কণ্টক, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। 'যদি মুক্তি চাও, কামিনী ও কাঞ্চনের মুখ দর্শন করিও না'—ইহাই তাঁহার জীবনের শিক্ষা। তিনি কঠোর ব্রহ্মচারী ও রমণী-বিদ্বেষী।

মীরা এই কথা শুনিলেন ও গোস্বামীকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"বৃন্দাবনে পুরুষ একমাত্র সেই প্রেমের আধার শ্রীকৃষ্ণ; অন্য সকল নরনারী যাঁহারা আছেন, সকলেই তাঁহারই প্রেমে বাস করেন। সেইজন্য সকলেই তাঁহার প্রেমিকা, তাঁহার সহিত একাত্মা। বিশ্বপ্রেমের এই শিক্ষা ভক্ত গোস্বামীর অবিদিত নহে, তথাপি যদি তিনি পুরুষ হইয়া আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের স্ত্রীলোকদিগের ঘরে চোরভাবে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন। অতএব তাঁহার এ-স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এই আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা-সম্বলিত পত্র পাইয়া ভক্ত গোস্বামী যার পর নাই বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, লেখিকা সামান্য-রমণী নহেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মীরাকে সাদরে তাঁহার মন্দিরে নিমন্ত্রণ করিলেন। মীরা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বল?" মীরা উত্তর করিলেন, "পিতঃ আমাকে আপনার নিকট থাকিয়া আপনার কণ্ঠনিঃসৃত ভগবানের গুণগান শুনিতে আদেশ দিন।" তখন হইতে মীরা গোস্বামীর মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী বলিতেন, মীরাই তাঁহার শিক্ষা-গুরু, মীরা বলিতেন গোস্বামীই তাঁহার গুরু।

ভক্তের আগমনে কিছুদিনের মধ্য বৃন্দাবনে মর্ত্তে স্বর্গের আবির্ভাব হইল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ ভক্তি-সহকারে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তুষার-শুভ্র হিমাচল-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া, গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী ও পঞ্চনদের আবাসভূমি, সুদূর মহারাষ্ট্র ও নীল জলধি-তীরবর্ত্তী দেশ-সমূহ পর্য্যন্ত সেই বৃন্দাবনের মন্দির-সোপানোপবিষ্টা মীরার উচ্চারিত গীত-সমূহ প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। মেবারের গ্রাম-সমূহেও সেই গীত-প্রস্রবণ ছুটিতে লাগিল। চিতোরের পথে পথে সকলের মুখে একই গান—"ভক্ত মীরা এই বলেন ইত্যাদি।"

এ-কাহিনী মহারাণার কর্ণেও উঠিল। তিনি বুঝিলেন মীরা তাঁহার পার্থিব সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া এখন কত উচ্চ মহা-সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন; সে সাম্রাজ্যের তুলনায় তাঁহার সাম্রাজ্য কিছুই নহে। পাছে লোকে বিধর্ম্মি-স্পর্শে কলঙ্কিত বলিয়া তাঁহার বংশের দুর্নাম করে, সেই জন্য তিনি তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; কিন্তু মীরা তাঁহার বংশের দুর্নাম করেন নাই, তিনি

সে বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। পৃথিবীর সকলেই মীরাকে ভালবাসে, মহারাণাও এখন তাঁহাকে ভালবাসেন। মহারাণা ছদ্মবেশে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যখন মহারাণা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, দেখিলেন মীরা মন্দির-সোপানোপরি আসীনা, তাঁহার স্বভাবতঃ রক্তরাগরঞ্জিত গণ্ডদ্বয় শুষ্ক পদ্মদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কিন্তু তাঁহার সেই সুমিষ্ট হাস্যটী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। মহারাণা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মীরা কহিলেন, "আমি নিজেই ভিক্ষুক, তোমাকে কোথা হইতে ভিক্ষা দিব? তুমি কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে যাও।" রাণা বলিলেন, "ভিক্ষুই ভিক্ষুকের সহায়।" মীরা বলিলেন, "কিন্তু আমি কি দিব, আমার যে কিছুই নাই।" মহারাণা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—"ক্ষমা"। মীরা লুণ্ঠিত হইয়া মহারাণার পদতলে পতিতা হইলেন। তিনি তখনও রমণী; উদ্বেলহৃদয়ে বলিলেন—"স্বামী! দেবতা! এতদিনে কি অভাগিনীকে স্মরণ হইল!"

তাঁহাদের মিলন কি সুখের! মহারাণা মহিষীকে পুনরায় সসম্মানে স্বরাজ্যে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু মীরা বৎসরের অর্দ্ধেক কাল সেই বৃন্দাবনের মন্দিরেই কাটাইতে চাহিলেন। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুযায়ী ত্যাগই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি সংসারে থাকিয়া পরমার্থ-চিন্তারই উপদেষ্টী ছিলেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"—গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে যে কার্য্যই করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।—ইহাই তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল।

মীরা বাইএর রচনার মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার গীত-সমূহের অনুবাদ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একটী গানের অনুবাদ দেওয়া হইল—"যদি জলে ডুবিলে মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে মৎস্যেরা অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। যদি নিরামিষ ভোজনে মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে বানর ও পক্ষীরা মুক্তিলাভ করিবে। যদি স্বচ্ছন্দোজাত তৃণাহারে মুক্তি হয়, তাহা হইলে হরিণ ও ছাগলেরা মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু মীরা বলেন, ভগবানের প্রেম ব্যতীত কিছুতেই মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ভগবান্‌কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর ও তাঁহাকে মহামূল্য রত্নের ন্যায় নিজ শরীরে ধারণ কর।" *

---

* উপরি উক্ত মীরাবাইএর কাহিনী এড্‌মণ্ড্ রসেল্-কর্ত্তৃক আমেরিকার একটী পত্রিকায় ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ তাহারই ভাবাবলম্বনে লিখিত। উক্ত লেখক বলেন, 'মীরাবাইএর জীবনী ও শিক্ষার বিবরণ হইতে আমরা ইহাই সংগ্রহ করিতে পারি যে প্রাচ্যদিগের ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট যে কি উচ্চ পদার্থ, তাহা আমরা আমাদিগের দেশে তাহাদের পৌত্তলিকতার বিষয়ে যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারি না।'

আমেরিকান্ লেখক মীরাবাইকে আকবর ও রূপ-গোস্বামীর সমসাময়িক করিয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ একটী জনবাদ আছে। কিন্তু ইতিহাস ইহা বলে না। ইতিহাসের মতে মীরা ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনী।

বিষে মধু।

পায়েতে তুমি ঠেলেছ ব'লে,
সবাই মোরে মাড়িয়ে যায়।
আমায় ছেড়ে রয়েছ স'রে,
বিষম তাই অবজ্ঞা-ভরে
লাঞ্ছনা ঘৃণা সবাই করে,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে সদাই চায়।

বাহান্ন-কোটি ব্যথার-পাকে,
হৃদয় চূর্ণ সংসার-চাকে,
চোখের জলে করুণ বাকে,
তোমারে ডাকি কাতরে তাই।

পাতার শনে, পাখীর-গানে,
মেঘের ডাকে, নিঝর-তানে,
স্নেহের স্বরে—কি মিষ্ট কাণে,
সান্ত্বনা তব শুনিতে পাই!

যদিও তুমি কাছে না আস,
লুকিয়ে মোরে ভাল তো বাস,
যখনি যত অভাব নাশ,
অলক্ষ্যে থেকে গভীর টানে।

হিমের ভেজা সবুজ ঘাসে,
হরিৎ পাকা ধানের রাশে,
জলে কি ফলে বাতাসে-বাসে,
পরশ তব পাই যে প্রাণে!

ভিতরে এত মধুর-মিশ,
আমারি আছ তো অহর্নিশ,
বাহিরে খালি চোখের বিষ,
কপট কোপে তোমার আমি।
পায়েতে তুমি ঠেলেছ ব'লে
ঠেলো নি হৃদে হৃদয়-স্বামী!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

সূর্য্যপূজা

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সূর্য্যের উপাসনা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঋগ্বেদেই শরীরের আন্তর ব্যাধি ও বিবর্ণতা দূর করিবার জন্য সূর্য্যের স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা প্রস্কণ্বঋষি ত্বগ্‌দোষ-শান্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। আমরা সূর্য্যের যতগুলি প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরে দেখিয়াছি, তাহাতে একমাত্র বুটের ন্যায় জুতা ব্যতীত অন্য কোন বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। পুরাণে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি "কঞ্চুক-গুপ্তঃ," "চোলকচ্ছন্নবপুঃ" ইত্যাদি রূপ হইবে, এই ভাবে বর্ণিত আছে;—তাহাও বিদেশীয় চিহ্ন নহে। ঋগ্বেদে আমরা বরুণদেবের শরীর সুবর্ণময়-কবচ-দ্বারা আবৃত, এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। "বরুণদেব সুবর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া স্বকীয় পরিপুষ্ট শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছেন। রশ্মিসমূহ (স্পশঃ) বা চরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে।" (১) বেদে বরুণ কখন মধ্যস্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্রের আকারভেদ, এবং কখন দ্যুস্থান-দেবতা বা সূর্য্যের আকারভেদ-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কোন স্থানে মিত্র ও বরুণ-দেব একত্রে মিত্রাবরুণরূপে স্তুত হইয়াছেন। বরুণ যখন মধ্যস্থান-দেবতা তখন তিনি আকাশকে মেঘজাল-দ্বারা আবৃত করেন বলিয়া বরুণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিত্র যখন মধ্যস্থান-দেবতা, তখন সমস্ত লোককে মরণ হইতে বর্ষণ-দ্বারা ত্রাণ করেন বলিয়া মিত্রনামে কথিত হইয়া থাকেন। (২) কখন সূর্য্যই মিত্রনামে দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বরুণ-নামে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে বেদে স্তুত হইয়া থাকেন। "হে দ্যোতমান রশ্মিসমূহ, এই সময়ে সূর্য্য উদিত হইলে তোমরা ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া আমাদিগকে পাপ হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক পালন কর। আমরা যাহা প্রার্থনা করিলাম, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ তাহার অনুমোদন করুন।"—এই মন্ত্রের (ক) ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য মিত্র মরণ হইতে ত্রাতা দিনের অধিষ্ঠাতা দেব ও বরুণ অনিষ্টের নিবারক রাত্রির অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে—ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র এই দ্বাদশ মূর্ত্তিদ্বারা আদিত্য-দেব সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন বা এই দ্বাদশমূর্ত্তি-দ্বারা আদিত্য-কর্তৃক জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে। (খ) যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে মধ্যস্থান ও দ্যুস্থানদেবতা-মধ্যে এই দ্বাদশ নামের অন্তর্গত দশটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই দশটী দেবতার স্তুতিবাচক এক একটী মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে প্রকাশ করিয়াছেন। (গ)

---

(১) বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্। পরিস্পশো নিষেদিরে ॥ ঋ, ১।২৫।১৩। সুবর্ণময়ং কবচং ধারয়ন্ বরুণো পুষ্টং স্বশরীরম্ আচ্ছাদয়তি। রশ্ময়ঃ সর্ব্বতঃ নিষন্নাঃ ॥ অন্যত্র স্পশঃ চরাঃ, স্পশন্তি স্পৃশন্তীতি ইতি স্পশঃ চরা ইতি সায়ণঃ। ঋ ৭।৮৭।৩।

(২) বরুণো বৃণোতীতি সতঃ ইতি যাস্কঃ। "বরুণঃ" কস্মাৎ? "বৃণোতীতি সতঃ," স হি বিয়দ্ বৃণোতি মেঘজালেন। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ, নিরুক্ত ১০।৩।২। "মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে ইতি যাস্কঃ। "মিত্রঃ" কস্মাৎ? স হি "প্রমীতেঃ ত্রায়তে", প্রমীতিঃ প্রমরণম্, ততঃ সর্ব্বলোকং ত্রায়তে বর্ষদানেন ইতি দুর্গাচার্য্যঃ, নিঃ ১০।২১।২।

(ক) অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা
মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ঋ ম ১।৮।৭।৬
মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়কোঽহরভিমানী দেবঃ।
বরুণোঽনিষ্টানাং নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানী।
ইতি সায়ণঃ।

(খ) ইন্দ্রো ধাতা চ পর্জ্জন্যঃ পূষা ত্বষ্টার্য্যমা ভগঃ।
বিবস্বানংশুর্বিষ্ণুশ্চ বরুণো মিত্র এব চ ॥
এভির্দ্বাদশভিস্তেন আদিত্যেন মহাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিস্তু নরাধিপ ॥
ভবিষ্য পুঃ ১ম অংশ ৭৪ অ ৮-৯

(গ) ত্বষ্টা ৬, ভগঃ ৮, সূর্য্য ৯, পুষা ১০, বিষ্ণু ১১, বরুণ ১৩—নিরুক্তে দ্যুস্থান-দেবতা ১২ অঃ। মধ্যস্থান-দেবতা ১০ম অধ্যায়ঃ—ইন্দ্রঃ ৪, পর্জ্জন্যঃ ৫, মিত্রঃ ১৩। ১১শ অধ্যায়ঃ—ধাতা ৬, অংশুঃ অর্থে সোমঃ চন্দ্রঃ। ১১ অ ও চন্দ্রমাঃ।

"যথা দেবা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি" ইতিনিগমো ভবতি—
নিঃ ৫।১১।১

বিবস্বান্ 'আদুত্যো অগ্নিমন্থয়িবস্বতো বৈবস্বতং মাতরিশ্বা পরাবতঃ। ঋ ৪।৫।১০।৮।

অংশু ও বিবস্বান্ এই দুইটি নাম দেবতা-সংখ্যার মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই দুইটি নাম আদিত্য-অর্থে বেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই বহু আদিত্যকেই লক্ষ্য করিয়া নিরুক্তে দেবতা-সংখ্যা-মধ্যে "আদিত্যাঃ" এই বহু-বচনান্ত দেবতাবাচক শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে ও তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঋগ্‌মন্ত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এইরূপ—"ঘৃতাহুতি-প্রদান-সূচক এই সমস্ত বাক্য (মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ব্বক চিরন্তন ও সর্ব্বলোকের রাজা আদিত্যগণকে জুহূসংজ্ঞক পাত্রের দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছি, আমাদের এই বাক্য মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুজাত ধাতা, বরুণ, দক্ষ ও অংশ শ্রবণ করুন। (১) উপরি উল্লিখিত নিরুক্ত ও বেদের মন্ত্র হইতে আমরা অবগত হইলাম যে ভবিষ্য-পুরাণে বর্ণিত দ্বাদশাদিত্য বেদেরই "আদিত্যাঃ"। এই আদিত্যের এক মূর্ত্তি বা আকারভেদ বরুণ এবং এই বরুণেরই শরীর সুবর্ণময় কবচ-দ্বারা আবৃত। সুতরাং মৎস্যপুরাণের "চোলকচ্ছন্ন-বপুঃ" ও ভবিষ্যপুরাণের "কঞ্চুকগুপ্ত" ইত্যাদি সূর্য্যের রূপ বেদ হইতেই পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বিদেশীয় চিহ্ন নহে। কেবলমাত্র যে সূর্য্যের রূপ বেদ হইতে পুরাণে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। পুরাণবর্ণিত আদিত্য-সম্বন্ধে অন্য উপাখ্যানও বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে সূর্য্যসম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে।—বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যম ও যমী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা তাঁহার পতি সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া ছায়াকে নিজের প্রতিনিধিরূপে পতির সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন। সূর্য্য ছায়াকেই নিজপত্নী সংজ্ঞা মনে করিলেন ও ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর ও মনু এই দুইটী পুত্র ও তপতী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। অনন্তর একদিন সংজ্ঞারূপিণী ছায়া মনুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে (তোমার পা খসিয়া যাউক্) এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন।—ইহাতে যম ও সূর্য্যের মনে সন্দেহ হইল যে ইনি সংজ্ঞা নহেন, অন্য কোন স্ত্রী হইবেন; কারণ, জননী স্বীয় পুত্রের প্রতি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে শাপ প্রদান করিতে পারেন্ না। তদনন্তর সূর্য্যের দ্বারা পৃষ্ট হইয়া ছায়া বলিলেন্ যে তিনি সংজ্ঞা নহেন, কিন্তু তাঁহার ছায়া। সূর্য্য সমাধিদৃষ্টিতে জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞা অশ্বারূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছেন। সূর্য্য তখন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরে অশ্বারূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে দেব অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে আর একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে সূর্য্যদেব স্বীয় ভার্য্যা সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের অসহ্য তেজ-হেতু কন্যার কষ্ট দেখিয়া সূর্য্যের অনুমতি-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রমি-যন্ত্রের (শাণ) উপর আরোপিত

---

(১) ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥
ঋ, ২।১।৬১।

করিয়া তাঁহার তেজ শাতিত করিলেন (তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন)। (১)

এই উপাখ্যান একটী ঋগ্‌মন্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ—সূর্য্যরশ্মিসমূহ অমৃতরূপা ইঁহাকে (সরণ্যুকে) মনুষ্যগণ হইতে গোপন করিয়াছিলেন ও সূর্য্যকে সমানবর্ণা একটী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। সরণ্যু অশ্বিনীদ্বয়কে উৎপাদিত করিয়াছিলেন ও মিথুনদ্বয় (যমজপুত্রদ্বয়কে) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন যে এই মন্ত্র-সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে।—ত্বষ্টার কন্যা স্ত্রী সরণ্যু বিবস্বান্ আদিত্য হইতে যম ও যমী এই মিথুনদ্বয় উৎপাদিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার সমানবর্ণা অন্যা স্ত্রীকে আদিত্যের নিকট রাখিয়া অশ্বারূপ-ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে সেই বিবস্বান্ আদিত্যও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরণ্যুর সমানবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে মনু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

(১) বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ২অ, ২—৮ শ্লোক।
সৌর পুরাণে আছে—"সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা ছায়া ভানো
স্তাঃ স্মৃতাস্ত্রিমাঃ। ৩০। ২৮

* অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বা সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ।
ঋ ১০। ১৭। ২

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্য আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব, ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ। নি ১২। ১০। ২।

বেদে সূর্য্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যু ও আর্য্যা, সূর্য্যের পত্নী, শক্তি বা বিভূতিরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। নিরুক্তে দ্যুস্থান দেবতা মধ্যে ইঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই উষার অবস্থাভেদ। যাস্ক নিরুক্তে এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্যার অর্থ-স্থানে তিনি বলিয়াছেন 'সূর্য্যা সূর্য্যস্য পত্নী' অর্থাৎ সূর্য্যা সূর্য্যের পত্নী। তাঁহার স্বরূপ কি তাহাও বলিয়াছেন—"এষৈব অভিসৃষ্ট-কালতমা ভবতি" অর্থাৎ এই সূর্য্যা প্রকৃত পক্ষে উষা। উষা যখন সূর্য্যের উদয়কালে প্রতিগততমা হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়কালে যখন উষার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া থাকে, সেই প্রকাশ অবস্থাকে সূর্য্যা বলে। (১) বৃষাকপায়ীও সূর্য্যের পত্নী বা বিভূতি। যাস্ক বৃষাকপায়ীর অর্থস্থানে বলিয়াছেন "বৃষাকপেঃ পত্নী, এষৈবাভিসৃষ্টকালতমা"। দুর্গাচার্য্য বলেন বৃষাকপি আদিত্যঃ উষাকালে অর্থাৎ অবশ্যায় বা তুষার বর্ষণ করেন ও সকলকে কম্পিত করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বৃষাকপি হইয়াছে। সূর্য্য যখন গততমা হন, তখনই তাঁহাকে বৃষাকপায়ী বলে এবং এই বৃষাকপায়ী অবস্থা যখন "প্রসৃতা" বিস্তারিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে সরণ্যু বলা হইয়া থাকে (সরণ্যূঃ সরণাৎ-যাস্কঃ)। রূপকভাবে এই সরণ্যুই ত্বষ্টার কন্যা। ত্বষ্টা বা সূর্য্যের কন্যা অর্থাৎ সূর্য্য হইতেই উৎপন্না। সূর্য্যের উদয়কালে তাঁহার কিরণ-দ্বারা অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া প্রভাতের এক একটা অবস্থা প্রকাশিত

(১) এষৈব উষা অভিসৃষ্ট-কালতমা। যদা সূর্য্যস্য উদয়কালো প্রতিগততমা ভবতি, তদা তথা সৈষা উষাঃ সূর্য্যা সম্পদ্যতে ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

হয়, সেই সেই অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন অবস্থা সূর্য্যের পত্নী, বিভূতি বা শক্তি। সূর্য্যের আলোক-শক্তির পরিণাম এইরূপ বর্ণনা হইতে পুরাণে সূর্য্যের পত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। "যমস্য মাতা মহতঃ বিবস্বতঃ জায়া ননাশ"—অর্থাৎ যমের মাতা (সরণ্যূ) মহান্ আদিত্যের জায়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অদৃশ্যা হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাস্ক এই রূপক-বর্ণনার অর্থ করিয়াছেন,—"রাত্রিরাদিত্যস্য আদিত্যো-দয়েঽন্তর্ধীয়তে।" রাত্রিই আদিত্যের জায়া অর্থাৎ পত্নী; রাত্রি আদিত্যের উদয়ে অদৃশ্যা হয় বা পলায়ন করে বলিয়াই সূর্য্যের পত্নী সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উষা-কাল সূর্য্যের উদয়ে বিদূরিত হয় বলিয়া উষাও সূর্য্যের জায়া। কারণ, পতি যাহাতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাকেই জায়া বলে। উষা কালে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন বা উদিত হন বলিয়া উষা সূর্য্যের পত্নী। এই কারণেই উষার বিভিন্ন অবস্থাও সূর্য্যের পত্নী, সূর্য্যের বিভূতি প্রকাশ করে বলিয়াও সূর্য্যের পত্নী। কোন স্থানে সূর্য্যা সূর্য্যের কন্যা-রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানে সূর্য্যা সূর্য্যের শক্তি, বিভূতি বা দীপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রায়চ্ছৎ সূর্য্যাং সাবিত্রীং"—ঐ ব্রা ৪। ২। ১। ইহার অর্থ প্রজাপতি সোম রাজাকে নিজ দুহিতা অর্থাৎ সূর্য্যা বা সাবিত্রীকে প্রদান করিলেন। এখানে প্রজাপতি সূর্য্য সূর্য্যাকে (নিজ দুহিতাকে) রাজা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই রূপকের অর্থ সূর্য্য নিজ বিভূতি বা দীপ্তি চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কারণ, অন্যত্র কথিত আছে আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।—আদিত্য হইতেই চন্দ্র দীপ্তি পাইয়াছে, অর্থাৎ আদিত্য-দীপ্তিই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে। যাস্ক একটী ব্রাহ্মণাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে আছে সবিতা সূর্য্যাকে রাজা সোমের বা প্রজাপতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। এখানেও এক অর্থে সূর্য্য নিজ দীপ্তি চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন; অপর অর্থে সূর্য্য নিজ কন্যা প্রজাপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্গাচার্য্য এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, নিরুক্তপক্ষে "জ্যোৎস্নাং সোমায় দদাতি" অর্থাৎ নিরুক্তমতে ইহার অর্থ চন্দ্রকে জ্যোৎস্না প্রদান করিয়াছিলেন; অন্য অর্থে (ঐতিহাসিক অর্থে) প্রজাপতিকে উষা প্রদান করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণে রাজ্ঞী ও নিক্ষুভা-নামে সূর্য্যের দুই পত্নী আছে এইরূপ বর্ণনা আছে। পরে এই দুই পত্নীর স্বরূপ কি তাহাও অন্যত্র এই-রূপে কথিত হইয়াছে।— * পূর্ব্বে সূর্য্যের দুইটী ভার্য্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাজ্ঞীকে দ্যৌ বলিয়া জানিবে ও নিক্ষুভাকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে। পৌষ-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্য্য রাজ্ঞীর

---

* প্রাগুক্তে হংশস্য যে ভার্য্যে রাজ্ঞী-নিক্ষুভ-সংজ্ঞিতে।
তয়োর্হি রাজ্ঞী দ্যৌর্জ্ঞেয়া নিক্ষুভা পৃথিবী স্মৃতা॥
পৌষস্য শুক্ল-সপ্তম্যাং রাজ্ঞ্যার্কঃ সহ যুজ্যতে।
মাঘ-কৃষ্ণস্য সপ্তম্যাং মহ্যা সহ ভবেদ্ রবিঃ॥
ভূয়াদিত্যশ্চ ভগবান্ গচ্ছেতে সংগমং তথা।
ঋতুস্নাতা মহী তত্র গর্ভং গৃহ্ণাতি ভাস্করাৎ॥
দ্যৌর্জলং সূয়তে গর্ভং বর্ষাস্বিহ ভূতলে।
ততস্ত্রৈলোক্য-ভূত্যর্থং মহী শস্যানি সূয়তে॥
—ভবিষ্যপুঃ ১ম ৭৯।৪-৭

সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। মাঘ-মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের সপ্তমীতে রবি পৃথিবীর সহিত অবস্থিতি করেন। এইরূপে তাঁহার উভয় পত্নীই জগতের উপকারের জন্য ঐ সময়েই গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্যৌ বর্ষাকালে পৃথিবীতে বারিপ্রসব (জল-বর্ষণ) করিয়া থাকেন। অনন্তর ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য পৃথিবী শস্য প্রসব করিয়া থাকেন। এই বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাণেরও অনেক বর্ণনাতে রূপকভাব রহিয়াছে। এই কারণেই পুরাণের অনেক স্থান বর্তমানে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের অভাবে দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্য্যের শরীর সুবর্ণময় কবচে আচ্ছাদিত, এই কথা বলিতে গিয়া সূর্য্যের স্ত্রীগণের প্রকৃত স্বরূপ উপলক্ষ্যে আমাদিগকে অনেক অবা .র কথা বলিতে হইল। অন্য প্রবন্ধে আমাদের সূর্য্য উপাসনা-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার ইচ্ছা আছে।

বিষ্ণুর বিবাহ।

(গল্প)

মহেশপুর পশ্চিমের একটী ক্ষুদ্র সহর। সে-দিন বিষ্ণুর বিবাহ। প্রাতঃকাল হইতে ছাত্রমহলে একটা বেশ উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। যেখানেই ২।৪টা ছেলে একত্র হয়, সেখানেই তারা যেন কোন গুপ্ত মন্ত্রণায় নিবিষ্ট!

বিষ্ণুর বাড়ী বর্দ্ধমান-জেলায়। কিন্তু সে গরীবের ছেলে, পিতৃহীন, সংসারের মধ্যে তাহার মা, দাদা ও বৌদিদি; সে-জন্য মহেশপুর তাহাদের গ্রাম হইতে অনেক দূর হইলেও সে মামার-বাড়ীতেই বরাবর প্রতিপালিত ও সেখানে থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। সেবার সে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবেমাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার মনটা বড়ই সাদা, সেইজন্য মহেশপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাকে ভালবাসে; বিশেষতঃ সমবয়স্ক ছাত্রমহলে তাহার বিশেষ খ্যাতি যে বিষ্ণুর মনের ভিতর কিছুই থাকে না, সকল কথাই সে বন্ধুদের কাছে বলিয়া ফেলে।

বিষ্ণুর বিবাহটা একটু নভেলি ধরণের। মহেশপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে তাহাদেরই গ্রামবাসী মুকুন্দবাবুর বাড়ীতে বিষ্ণু প্রায়ই যাতায়াত করিত। মুকুন্দবাবু সেখানকার সেরাস্তাদার। মুকুন্দবাবুর পরিবারের সকলেই বিষ্ণুকে খুব স্নেহ করিত; বিশেষতঃ মুকুন্দবাবুর দুই কন্যা কমলা ও চপলা তাহার বড়ই অনুরক্তা। কমলার বয়স ১২ বৎসর, চপলার ৯ বৎসর। মুকুন্দবাবুর স্ত্রীর যত্নে ও তাঁহার দুই কন্যার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহার মাতুলের কঠোর শাসনের হস্ত হইতে একটু অব্যাহতি পাইবার অবকাশ পাইলেই গোবিন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা এত দূর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে বিষ্ণু মুকুন্দবাবুর পরিবারের মধ্যে একজন বলিয়াই সকলে জানিত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘ দুই মাসকাল বিষ্ণু গোবিন্দপুরে কাটাইতে মনঃস্থ করিয়াছিল,

এবং মুকুন্দবাবুর স্ত্রীর সবিশেষ অনুরোধে আমের সময়টা তাহাকে গোবিন্দপুরেই কাটাইতে হইল। এই সময় কাজের মধ্যে দুই সঙ্গিনী কমলা ও চপলার সহিতই বেশীর ভাগ গল্প করা, বাগান বেড়ান ও আম পাড়া ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহাদের এই নির্দোষ ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই বিধাতা অন্যরূপ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাহাদের জীবনের এই নূতন সন্ধিস্থলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহাদের বাল্যানুরাগ ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইতেছে। তখন যেন তাহাদের পরস্পরের অল্প সময়ের ছাড়াছাড়িও কষ্টকর বোধ হইত। তাহাদের এই অনুরাগ মুকুন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁহাদের দুজনেরই বরাবর ইচ্ছা ছিল বিষ্ণুর সহিত কমলার বিবাহ দিয়া বিষ্ণুকে তথাকার সেরেস্তার কোন কাজ করিয়া দেন। সেইজন্য তাহাদের এই অনুরাগে তাঁহারা সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইলেন না। বিষ্ণুর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া সকলেই সুখী। সেই শুভসংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য বিষ্ণু একবার মহেশপুর ও দেশে যাইবে স্থির করিল। মুকুন্দবাবু এই সুযোগে বিষ্ণুর মাতুলের নিকট বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। বিষ্ণুও দেশে গিয়া তাহার মাতৃদেবীকে ধরিয়া বসিল, কমলা ব্যতীত আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। সুতরাং বিষ্ণুর দাদা কন্যা দেখিবার জন্য মহেশপুর রওনা হইল ও সেখান হইতে তাহার মাতুলকে লইয়া গোবিন্দপুরে মুকুন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সুন্দরী কমলাকে অপছন্দ হইবার কোনই কারণ ছিল না, বিশেষতঃ কন্যা যখন পাত্রের নিজেরই মনোনীত। কাজেই আশীর্বাদ হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিন স্থির হইল। বিষ্ণুর এই সকল ভালবাসার বিবরণ সে খোলা প্রাণে বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া প্রাণ হাল্কা করিয়াছিল এবং বন্ধুরাও বিষ্ণু-কমলার এই মিলন দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। কিন্তু বিষ্ণুর অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নয় যে, সে সকল বন্ধুকে বরযাত্রায় নিমন্ত্রণ করে। মুকুন্দবাবু কন্যার প্রতি পাত্রের অনুরাগ দেখিয়া যত অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; অর্থাৎ বিষ্ণু এক-রকম বিনা খরচেই বিবাহে রাজী।

বিবাহের দিন দেখা গেল মহেশপুর ষ্টেসনে বিষ্ণুর কোন বন্ধুই বাকি নাই। সকলেই বিষ্ণুর বিবাহে যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণুর দাদার বয়স বিষ্ণু অপেক্ষা ২।৪ বৎসরের অধিক। সে এই সমস্যায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিজেদের মত খানকয়েক টিকিট ক্রয় করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। তখন সকলেরই ধারণা হইল, বিষ্ণুর দাদা সকলেরই টিকিট ক্রয় করিয়াছে। যুবকেরা সকলেই বিষ্ণুকে ঘেরিয়া গাড়ীতে উপবিষ্ট হইল। গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল, এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমাল শুনা গেল। ষ্টেসন-মাষ্টার আসিয়া বলিলেন যে, টিকেট চেকার বলিতেছে যে ১০০।১৫০ বর যাত্রীর মধ্যে মোটে ৮।১০ খানি টিকিট লওয়া হইয়াছে, বাকী টিকিট না লইলে তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং গাড়ীরও বিলম্ব করা হইবে না। হঠাৎ সকলে একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

তখন তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা গোবিন্দপুরে নামিয়া টিকেটের দাম দিবেন, এ বিষয় গার্ডকে জানান হোক্। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেসন-মাষ্টার ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ব্যাপার টেলিগ্রাফ করিলেন। উত্তর আসিল, 'ভাড়া আদায় করিয়া লও।' গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, কাজেই তিনি মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিলেন। গাড়ী সেই ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্রই তথাকার ষ্টেশন-মাষ্টার টেলিগ্রাম লইয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও সকলের ভাড়া চাহিলেন। কিন্তু অত যাত্রীর ভাড়া আদায় প্রভৃতি অনেক বিলম্বের ব্যাপার। তিনি বলিলেন, অতক্ষণ গাড়ীর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। বর ও তাহার সহিত কয়েকজন সেই গাড়ীতে যাইবে এবং বাকী সকলে ভাড়া দিয়া পরের ট্রেনে যাইবে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। কাজেই বিষ্ণুর দাদা বিষ্ণু ও কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিষ্ণুর বন্ধুরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সমস্বরে বিষ্ণুকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল এবং বিষ্ণুও যতক্ষণ গাড়ী হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ হাত নাড়িয়া তাহাদের আসিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। গাড়ী ষ্টেশনের বহির্ভূত হইলে হঠাৎ বিষ্ণুর মনে পরিবর্ত্তন, লক্ষিত হইল। তাহার মনে বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল যে সে তাহার বন্ধুদের বিপদে ফেলিয়া নিজে নিশ্চিন্তমনে বিবাহ করিতে যাইতেছে। সে ধরিয়া বসিল যে বন্ধুদের ফেলিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিতে যাইবে না। তখনই সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতে উদ্যত। তাহাকে অনেক বুঝাইয়া তখন নিবৃত্ত করিয়া রাখিলেও পরের ষ্টেশনে সে নামিয়া পড়িল। তাহার কয়েকজন সঙ্গীও অগত্যা নামিল।

বিষ্ণুর দাদা অনেক বুঝাইয়াও তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া কন্যাকর্ত্তাকে এই সংবাদ দিবার জন্য সেই ট্রেণেই রওনা হইল। বিষ্ণু বন্ধুদের জন্য পরের ট্রেণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিষ্ণুর দাদা অত্যন্ত রগ-চটা লোক। বিষ্ণুর অবাধ্যতায় সে অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। সে গোবিন্দপুরে উপস্থিত হইয়াই একেবারে মুকুন্দবাবুর নিকট যাইয়া বলিল, "মহাশয়, আমার ভাই আমার বাধ্য নয়! সে বিবাহ করিবে না, রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। আমরা যখন আপনার কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছি, ইচ্ছা হইলে, আপনি আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। আমার একবার বিবাহ হইলেও, আপনাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে আমি প্রস্তুত।" মুকুন্দ বাবু কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। বাড়ীতে বর আসে নাই ও বিষ্ণুর দাদা বলিতেছে, বিষ্ণু বিবাহ করিবে না। এই সব শুনিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এ-দিকে লগ্ন চলিয়া যায়। বিষ্ণুর দাদাও আপনার সহিত কমলার বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার একটী পত্নী বর্ত্তমান। সে-জন্য মুকুন্দবাবু তাহাতে রাজী হইলেন না। নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাঁহারই দেশস্থ একটী অবিবাহিত যুবক ছিল, তাহাকেই তিনি সে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া কমলা

দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায়া হইয়া মাতাকে বলিল এরূপক্ষেত্রে সে আর বিবাহই করিবে না। কিন্তু হায়, সামাজিক নিয়ম ভিন্নরূপ। তাহার আপত্তি শুনিবে কে! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে! সেই লগ্নে কমলা পাত্রস্থা হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী ট্রেণে বিষ্ণু আনন্দচিত্তে বন্ধুদের সহিত আমোদ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মুকুন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সে নিশ্চিন্ত ছিল যে যতই বিলম্বে সে উপস্থিত হোক্ না কেন, এ বিবাহ তাহাদের কেহই রোধ করিতে পারে না। কিন্তু হায় একি নিদারুণ সংবাদ! তাহার চির জীবনের আশা, তাহার বাল্যসঙ্গিনী কমলা, যাহার জন্য সে সারা জীবন অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত, সে আজ সামান্য ২।৩ ঘণ্টা মাত্র অপেক্ষা করিতে পারিল না! তাই বুঝি ঔপন্যাসিক বলিয়াছেন, বাল্য-প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। দুঃখে শোকে বিষ্ণু হতজ্ঞান হইল। বন্ধুরাও তাহার এই বিপদে স্তম্ভিত, বিষ্ণুকে কি বুঝাইবে! বিষ্ণু মুকুন্দ-বাবুর নিকট প্রার্থনা করিল সে একবার কমলার সহিত শেষ দেখা করিতে চাহে! তাহার মুখের কথা শুনিয়া তাহারই স্মৃতি লইয়া সে সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। মুকুন্দবাবু তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দুই প্রেমিক হৃদয় অচল প্রাচীরের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অজস্র ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দুই হৃদয়ের আজীবন সঞ্চিত আশা দুই ঘণ্টায় বিলম্বে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! অতিকষ্টে বিষ্ণু বলিল, "কমলা, তুমি এ কি করিলে!" কমলা আর স্থির থাকিতে পারিল-না, ভগ্ন-চ্যুতা-লতার ন্যায় বিষ্ণুর পদতলে পতিত হইল। সকলে তাহাকে তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ইতমোধ্যে মুকুন্দবাবু মনে মনে অন্য সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এই সুপাত্র হাত-ছাড়া হয় দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও তোমাদের মিলন হইল না, তখন তাহা বিধাতার অভিপ্রেত নয় বুঝিতে হইবে। তাঁহার বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সে-জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। কিন্তু বিবাহ করিতে আসিয়া তুমি রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইবে, ইহা নিদারুণ হইবে। সে-জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আমার চপলাও প্রায় বিবাহযোগ্যা এবং তাহারও তোমার প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। তোমার অমত না থাকিলে কল্যকার শুভলগ্নেই তোমাদের দুই হাত এক করিয়া দিই।" বিষ্ণুর মনে কমলার শোক দেদীপ্যমান। সে নিজের অবস্থা তখনও সম্যক্ ধারণা করিতে পারিতেছিল না। সে তখনও ভাবিতেছিল, কমলার স্মৃতিমাত্র হৃদয়ে লইয়াই সমুদয় জীবন অতিবাহিত করিবে। মুকুন্দবাবু বলিলেন, "তুমি এ বিষয় ভাবিয়া আমাকে উত্তর দিও; কাল পর্য্যন্ত তোমার সময় আছে।"

ইতোমধ্যে বাটীর ভিতরে বিষ্ণুর ডাক পড়িল। কমলা তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, সে বিষ্ণুকে কি বলিতে চাহে। বিষ্ণু অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়নে কমলার নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু কমলার এ-কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই চিরহাস্যময়ী কমলা স্থিরা গম্ভীরা! এই অল্পক্ষণের মধ্যে যেন তাহার বয়সের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কমলা অশ্রুভরে বলিল, "আজ তোমার কাছে একটা শেষ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কি আমার সে প্রার্থনা রাখিবে?" কমলাকে বিষ্ণুর কিছুই অদেয় ছিল না। বিষ্ণু সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সত্যবদ্ধ হইলে, কমলা বলিল "তুমি আমাকে চিরদিন ভগ্নীর মত ভালবাসিয়াছ, সেইজন্য আমার অনুরোধ, তুমি আমার ছোট ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সেই সম্বন্ধ অটুট রাখ। ইহাতে আমার পিতা, মাতা ও আমি সুখী হইব, এবং তুমিও পরে সুখী হইবে।" বিষ্ণু কমলার এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

পরদিন শুভলগ্নে বিষ্ণুর সহিত চপলার বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই ভবিতব্যের লীলা দেখিয়া অবাক্ হইল।

মহেশপুরে বিষ্ণুকে এই উপলক্ষ্যে বন্ধুদের নিকট অনেক দিন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু চপলা বিষ্ণুর সে মনঃকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছিল।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও মন্তব্য।

১। পুরাণতত্ত্ব (১মভাগ)—

শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত ও তত্ত্বপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্, ১নং পঞ্চকোশী রোড্, নাগোয়া, কাশী হইতে প্রকাশিত। মূল্য।/০

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে কথোপকথনের ছলে পুরাণের উৎপত্তি, উপযোগিতা ও প্রাধান্য প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছে। মাত্র প্রথম ভাগ হইতে গ্রন্থকারের সমগ্র মত বুঝা গেল না। এ ক্ষেত্রে সবিশেষ সমালোচনা চলে না; তথাপি দুই একটা বক্তব্য আছে। কথোপকথনের ভাবরক্ষার্থ অনেক অবান্তর কথা আসিয়াছে। দুই এক স্থলে রঙ্গরস করিবার জন্য অত্যন্ত অশোভন বিষয়ের—যথা এক্কা নং ওয়ান্– উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণতত্ত্বে এরূপ প্রহসনোচিত বিষয়ের সমাবেশ অসঙ্গত মনে হয়। যাহা হউক্, কয়েকটী সুন্দর সিদ্ধান্ত ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। পুরাণসমূহ যে বেদেরই ন্যায় নিত্য বস্তু, ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত একটু বিস্তৃতভাবে সমর্থন করা উচিত ছিল। গ্রন্থে ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের যে অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত, তাহা একনিঃশ্বাসে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। উপযুক্ত হেতু ব্যতীত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ্যলোপ হয় না। দ্বিতীয়াদিভাবে অপর পুরাণগুলির আলোচনা আরও যুক্তিযুক্ত ও দোষবর্জ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী।—

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়-বাহাদুর লিখিত।

হিন্দুয়ানীর চাপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লোপ পাইতে চলিল, ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ভাল করিয়া তাহা বুঝান হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার উপায়টিও বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। মূল্য ।০ আনা; ৪নং উইলিয়মস্ লেন হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা প্রকাশিত।

৩। মিলন (২য় সংখ্যা) নূতন সচিত্র মাসিক পত্র।

ইহা-মিলন সভার মুখ-পত্র। প্রারম্ভেই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার নিয়ম ও সভ্যের অধিকার বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানরাজ্যের বিবিধ বিভাগের প্রবন্ধের একত্র সমাবেশে পত্রিকার 'মিলন' নামটি সার্থক হইয়াছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০। কলিকাতার ২৫নং হ্যারিসন রোডস্থ 'মিলন মন্দিরে' প্রাপ্তব্য।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ ! চতুর্থ সংস্করণ ! চতুর্থ সংস্করণ !

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸৹ এক টাকা বার আনা। মাশুল ৵৹ আনা

Amritabazar Patrika বলেন— * * * The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. * * *

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible * * * making the book up to the mark,

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। * * *

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। * * * ভাতৃপ্রেম পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। * * * অহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। * * *

"পুরুলিয়া দর্পণ":—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষায় উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—রামময় আশ্রম।

বৈদ্যনাথধাম—কুণ্ডা। (ই আই, আর)

August, 1922. Reg. No. C. 134

৬০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।
আশ্বিন, ১৩২৯—অক্টোবর, ১৯২২।

সূচী

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক [illegible] প্রকাশিত ও [illegible]
মুদ্রিত [illegible]



বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 710. October, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩২৯। আক্টোবর, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭১০ সংখ্যা।		৩য় ভাগ

অবাক্।

কত গান ছিল গাঁথা
প্রাণে,
সে সকলে গেনু ভুলে'
চাহি' মুখ-পানে!

তোমারি আঁখির বাণী
নীরবিল বীণাখানি,
প্রাণে হ'ল জানাজানি
—নয়ানে নয়ানে!

আনন্দ-সমুদিত
যা'রে
তাই সুর অবলীন
অরূপ-বিতারে!

তব সুধা-শীত হাসে
কত শশী পরকাশে,
মধুমাস নিশোশ্বাসে
পরিমল-গানে!

আজি বোধ দিশেহারা,
তোমারি নয়ন তারা
ঢালে প্রিয় রূপ-ধারা
—হৃদিগত মানে!

সঙ্গীত প্রকটিত,
তাহে
সুর হ'ল অবলীন
অবগাহে!

তুমি সুখ-সুন্দর
বাক্-তনু-মনোহর
বাহিরও অন্তর
জাগাও জ্ঞানে!

শ্রীসুধেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ক্রিয়াযোগ কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিতেছেন। তিনি পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান, এই উভয় বিষয়েরই উপদেশ দিয়া তত্ত্বকথা বুঝাইয়াছেন। তথাপি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আবার সেই বিষয়েরই প্রকারান্তরে উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, অর্জ্জুন! কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে নিষ্কামভাবে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করেন, তিনি সন্ন্যাসীও এবং যোগীও। অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, এই উভয়েরই গুণ ও প্রাপ্য-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি নিরগ্নি অথবা অক্রিয় নহেন।" অর্থাৎ তিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্মত্যাগী বা অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাখ্য-কর্ম্মত্যাগী নহেন। কোন কোন সাধক ইষ্টফল-লাভের জন্য অগ্নিরক্ষা ইত্যাদি করেন এবং কেহ কেহ অগ্নিরক্ষা না করিয়াও কূপ ও পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি কার্য্য করেন। এইরূপে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টফল-লাভের জন্য বিবিধপ্রকার সাধন করেন। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন, "যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করেন, তিনি এ সকলেরই ফল প্রাপ্ত হন; বরং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপই হন এবং নির্ব্বাণ-মুক্তি পাইয়া পরমশান্তি লাভ করেন।" তিনি আরও বলিলেন যে সন্ন্যাস এবং যোগ এ দুটি পৃথক বস্তু নহে, অর্থাৎ উভয়েরই ফল একই মুক্তি। বিশেষতঃ মন হইতে সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প অথবা বাসনা পরিত্যক্ত না হইলে, কেহই যোগী হইতে পারে না।

এক্ষণে ভগবান্ ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান যে কি তাহা না বলিয়া অগ্রে কে ইহার অধিকারী এবং কাহার ইহাতে উপকার হইবে, তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যোগ কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে সদা যুক্ত তাহাই অনুভব করা। ইহা একটি সাধকের অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থা যিনি পান নাই, অথচ পাইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ যিনি আরুরুক্ষু [কোন না কোন কামনার সহিত সাধন আরম্ভ যিনি দৃঢ়তার সহিত তাহা করেন তিনি করিয়া আরুরুক্ষু] যোগী, তিনিই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিবার অধিকারী এবং রীতিমত নিয়ম-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহারই ইহাতে উপকার হয়, অর্থাৎ কালে উক্তযোগাবস্থা অনুভব করিবার সামর্থ্য হয়। কিন্তু যিনি সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত যোগাবস্থা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, অর্থাৎ যিনি যোগারূঢ়, তাঁহার পক্ষে অধিক ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার পক্ষে সদা সমাধিস্থ হইয়া ঐ যোগানুভবই শ্রেয়োজনক। তাঁহাকে ক্রিয়াযোগ সামান্য করিয়া সমাধিরই সমধিক অভ্যাস করিতে হইবে।

এই যোগারূঢ় অবস্থাটি কি তাহাও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, "যে সাধক ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত ও অনুরক্ত না হন, সম্পূর্ণ কামনা-শূন্য হইয়া কেবল উক্ত যোগাবস্থাই অনুভব করিতে থাকেন, তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তির অধিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করার আবশ্যকতা নাই এবং তিনি করিতেও পারেন না। কারণ, ক্রিয়ানুষ্ঠানটী উপায়, আর যোগাবস্থানুভব তাহার ফল। মানুষ উপায় হইতে ফল প্রাপ্ত হইলে আর উপায়ের দিকে তত লক্ষ্য রাখে না, তখন কেবল ফলাস্বাদন করিতেই থাকে। কেবল ফলাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি উপায়রূপ ক্রিয়াও কিছু কিছু করেন মাত্র। তখন তিনি সমাধি অবলম্বনে বিভোর হইয়া ঐ যুক্তাবস্থাতেই স্থিত থাকেন।

তাহার পর ভগবান্ আর একটি কথা অর্জ্জুনকে বলিয়া দিয়া সতর্ক করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'দেখ অর্জ্জুন, আত্মাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে, কোন মতে উহাকে যেন অধঃপতিত না করা হয়। কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।

দেহস্থ ষট্‌-চক্র মধ্যে আজ্ঞাচক্রই ঊর্দ্ধ স্থান। ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া প্রাণ-বায়ুকে এই স্থানে স্থির রাখিতে পারিলেই আত্মাকে উদ্ধার করা হয় এবং এখানে না রাখিতে পারিলেই আত্মাকে অধঃপাতিত করা হয়। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বদা ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে উদ্ধার করিতে—অধঃপাতিত না করিতে উপদেশ দিলেন।

এরূপ করিলে ফল কি হইবে তাহাও বলিতেছেন। তিনি বলিলেন যে এই যোগানুষ্ঠানকারী আত্মবশ, ও প্রশান্ত হইয়া পরমাত্মাতেই সমাহিতচিত্ত হন, সুখ দুঃখ ও মানাপমান তাঁহার সমান বোধ হয় ; তাহাতে তিনি চঞ্চল হন না। তিনি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্তচিত্ত হইয়া প্রস্তর ও কাঞ্চনকে সমান দেখেন, সদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া কূটস্থ পরমাত্মাতেই রমণ করিতে থাকেন এবং যথার্থই যুক্তযোগী হন। তিনি এখন অরি-মিত্র, মধ্যস্থ ও দ্বেষ্য, সাধু ও পাপী সকলেতেই সমবুদ্ধি হন ; কোন বিষয়েই দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া চঞ্চল হন না, সদা সর্ব্বত্র এক সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই বিরাজিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

এখন সেই ক্রিয়াযোগের কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'অর্জ্জুন, সাধক-যোগীকে প্রথমে একান্ত প্রদেশ অর্থাৎ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার মনের চঞ্চলতা উৎপন্ন না হয়। সেই নির্জ্জন স্থানে এমন একটি জায়গায় বসিতে হইবে যে জায়গাটি অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু না হয় এবং যেখানে কোনরূপ কঙ্কর ইত্যাদি অসুখকর দ্রব্য না থাকে। তথায় প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তদুপরি মৃগচর্ম্ম রাখিয়া এবং সর্ব্বোপরি বস্ত্র পাতিয়া তদুপরি বসিবে। কিন্তু এরূপভাবে বসিবে যাহাতে তোমার শরীর ও গ্রীবা সরল থাকে, বক্র না হয়। এইরূপ স্থানে ও এইরূপে বসিয়া মনকে একাগ্র করিবে, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে না। আত্মশুদ্ধির অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইবার জন্য যোগাভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ

প্রাণায়াম করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করতঃ অন্য কোন দিকে বা বস্তুতে লক্ষ্য না করিয়া প্রশান্তমন, নির্ভয় ও ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্ম-সত্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া থাকিবে।' আর যাহা করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট বলিলেন না : তাহা গুরূপদেশগম্য। তাহা গুরুমুখী বিদ্যা, সাক্ষাৎ সদ্‌গুরুর সমীপে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস করিলেই ব্রহ্মনির্বাণ পাওয়া যাইবে অর্থাৎ শান্তিময় ব্রহ্মরূপেই পরিণত হইতে হইবে। ইহাই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান।

উপরে গুরূপদেশগম্য যাহা বলা হইল, তাহা একটি দৃষ্টান্তের বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। অশ্বথ ও বটবৃক্ষের তলে শতসহস্র পক্কফল পতিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে একটিও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাক সেই বৃক্ষের পক্কফল খাইয়া পাষাণে পর্য্যন্ত মল-পরিত্যাগ করিলেও সেই মল-মধ্যগত বীজ হইতে অব্যর্থরূপে বৃক্ষ জন্মায়। বীজমধ্যে অবশ্য বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু তাহা কার্য্যোন্মুখ না করিয়া দিলে বৃক্ষ হয় না। কাকের উদরে বীজ সেই জননশক্তি পায় বলিয়াই মৃত্তিকার কথা দূরে থাক্ পাষাণেও বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক মানুষেরই শরীরমধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু তাহা নিদ্রিত অবস্থায় আছে। সদ্-গুরু নিজ জাগ্রৎ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মন্ত্র দিয়া শিষ্যের সেই নিদ্রিত শক্তিকে জাগরিত করিয়া দেন। তাহার পর একান্ত উৎসাহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া অভ্যাস করিলেই কালক্রমে গুরুর ও ভগবানের মাহাত্ম্যে সিদ্ধিলাভ হয়।

কিন্তু এই যোগ-সিদ্ধির কতকগুলি অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা আছে, যাহাতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তাহাও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'অর্জ্জুন, অধিক আহার করিলে কিংবা একেবারেই অনাহার থাকিলে এবং অধিকনিদ্রার সেবা করিলে কিংবা অধিক জাগরণেও যোগ সিদ্ধ হয় না। আহার, বিহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই সংযম ও নিয়ম অবলম্বন করা সাধকযোগীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, উপযুক্তরূপ আহার, নিদ্রা ইত্যাদির সেবা করিলে তাহাতে যোগীর দুঃখ দূর হইয়া সুখ-বৃদ্ধি হইতে থাকে। অথবা সদা ব্রহ্মে যুক্ত, এইরূপ অনুভব করিয়া উক্ত সকল ব্যবহার সম্পাদন করিলেই দুঃখ অপগত হইয়া সুখ প্রকাশিত হয়।

এই যুক্তির অর্থও তিনি বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন, যখন সাধকের চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল ব্রহ্ম-সত্তাতেই রমণ করিতে থাকে, তখনই সে ভাগ্যবান্ সাধককে যুক্ত বলা যাইতে পারে। তখন সেই সাধকের চিত্ত জলে লবণপিণ্ডের মত ভক্তিরসে বিগলিত হইতে থাকে। অন্য কোন ভাব বা চিন্তা সে-চিত্তে উদয় হয় না।' উপমা দিয়া তিনি বুঝাইতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার বাতাসশূন্য স্থানে প্রজ্জ্বলিত দীপ যেমন কোন দিকে না হেলিয়া কেবল ঊর্দ্ধশিখ হইয়া শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ উক্ত সাধকের চিত্ত তখন কেবল ব্রহ্মসত্তাতেই বিরাজিত থাকে। তখন এই ক্রিয়াযোগ-মাহাত্ম্যে সাধক সকল বিষয় হইতেই চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া কেবল আত্মদর্শন

করিয়া পরম শান্তিসুখ অনুভব করিতে থাকেন। সে সুখ অতীন্দ্রিয়। সাধক তাহা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইয়া তাহাতেই দৃঢ়রূপে স্থিত হইয়া থাকেন। সে পরম ধন প্রাপ্ত হইলে তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুই প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না এবং সে অবস্থা বা পদ-লাভ হইলে গুরুতর দুঃখেও চিত্ত চঞ্চল হয় না। ইহাই সর্ব্ববিধ দুঃখরহিত যোগানুভূতির অবস্থা। অনন্তমনে ইহার সেবা করিয়া যোগীর যুক্ত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। তখন সংকল্পজাত সকল কাম্য বিষয় অশেষপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করতঃ অতুলনীয় ধারণার শক্তির প্রভাবে চিত্তকে সকল বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া কেবল আত্ম-সত্তাতেই স্থিত হইয়া সাধক আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবেন না। তখন পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ যদি মন কোন বিষয়ে ধাবিত হইতে চাহে, তাহা হইলে অতিদৃঢ় প্রযত্নের সহিত তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া ব্রহ্মসত্তাতেই স্থিত রাখিবেন। এইরূপ নিষ্পাপ ব্রহ্মভূত হইতে পারিলেই শান্তিময় সুখই প্রাপ্ত হইবেন। সতত ইহার অভ্যাস করিলেই যোগী নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হইবেন। তখন তিনি যাবতীয় বস্তুতেই ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিতে থাকিবেন এবং জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড যে সেই ব্রহ্মাধিষ্ঠানেই অধিষ্ঠিত, তাহাও দেখিতে থাকিবেন; সুতরাং তখনই যথার্থরূপে সমদর্শী হইবেন।

ভগবান্ আর ও বলিলেন, যে-সাধক-যোগী উক্তরূপে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্তা দর্শন করেন এবং সকলই যে ব্রহ্মসত্তা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিতে থাকেন, তাঁহাকে কখনই আমি নষ্ট করি না এবং তিনিও আমাকে কখনই নষ্ট করেন না। অর্থাৎ সদাই তিনি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে থাকেন এবং তিনিও কখনই ব্রহ্মের অদৃশ্য হন না। এরূপ যোগী সকল বিষয়েই নিযুক্ত থাকিয়া প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মসত্তাতেই বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি সুখ বা দুঃখ কোন অবস্থাতেই আত্মা-দর্শন-চ্যুত হন না। সুতরাং তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ।

ভগবানের এই সকল কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনি যে এই সমদর্শিতারূপ যোগের কথা বলিলেন, মনের চঞ্চলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি তাহার স্থিরতার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বায়ুকে যেমন দমন করা সুকঠিন সেইরূপ এই প্রমথনশীল চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

ভগবান্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "অর্জ্জুন মনকে নিগ্রহ করা বাস্তবিকই বড় সুকঠিন। কিন্তু ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান ও নিত্যানিত্য বিবেকজ বৈরাগ্য-সাহায্যে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার মতে অসংযতচিত্ত ব্যক্তিরা আদৌ যোগ পাইতে পারে না। কিন্তু সদ্-গুরূপদিষ্ট মহাত্মারা গুরুপ্রদর্শিত উপায়-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবশী হইয়া তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে আর একটি সংশয় উত্থিত হইল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! যে সাধক-যোগী যোগ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করেন, কিন্তু ইহ জন্মে সিদ্ধ হইবার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান পাইবার পূর্ব্বেই শিথিলতা-বশতঃ সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হন, এরূপ ব্যক্তির কিরূপ গতি হইয়া থাকে? তিনি কি ইহ-পরকালে ভ্রষ্ট

হইয়া শরতের ছিন্ন মেঘবৎ প্রণষ্ট হইয়া যান? হে ভগবন্! আমার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আর অন্ত কেহই ইহা দূর করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং আপনি ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে নিঃসন্দেহ করুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, এরূপ ব্যক্তি বা সাধক ইহলোকে অথবা পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ প্রাপ্ত হন না। হে তাত! কল্যাণ-পথাবলম্বী কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মরণান্তে পুণ্যবান্ লোক-দিগের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর সুখ ভোগ করতঃ পবিত্র ও শ্রীমান্ লোকদিগের গৃহে অথবা যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথায় পূর্ব্ব-দেহস্থ বুদ্ধিযোগ স্বতঃ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধির জন্ত প্রযত্ন করিতে থাকেন। তাহার পর পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস-বশতঃ যেন অবশ হইয়াই যোগ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন এবং শব্দব্রহ্ম যে বেদ তাহাকেও অতিক্রম করেন অর্থাৎ বেদের অজ্ঞানমূলক অথচ চিত্তশুদ্ধি-কারক কর্ম্ম-কাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। যদি এক জন্মে না হয়, তবে বহু জন্মেও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন। অর্জ্জুন, এই যোগী পুরুষ তপস্বী হইতেও শ্রেষ্ঠ, শুষ্কজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি ক্রিয়াযোগ প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপই হইয়া যান। তাই হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু এই যোগীদিগের মধ্যেও যিনি মদ্গতান্তরাত্মা হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি আর আমি ভিন্ন স্বীয় পৃথক্ আমিত্বের অনুভব করেন না।'

এই প্রকারে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জ্জুনকে কিরূপে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিতে হয় এবং তাহার কি অমৃতময় ফল, তাহা বাক্যে যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম অভ্যাস যোগ। যে যোগী সরলচিত্তে ভক্তিসহ অনুষ্ঠান করেন, কেবল তিনিই ইহার মর্ম্ম অবগত হন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সাধারণ ভাবে ধর্ম্মাচরণের ফল অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহ-জন্মে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহ-জন্মেই তাহা জীবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্মের ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি বলিয়া দ্বিবিধ ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ব্যাকুলতা।

ওগো তুমি কোন্ অজানায়!
কোন্ দেশে কত দূরে অচেনা সাগর-তীরে
সেথা হ'তে একবার ডাকনা আমায়!
ওগো তুমি কোন অজানায়!

সেথা কি কোকিল গাহে, মলয়া এমনি বহে?
সেথাও কি এই চাঁদ কৌমুদী ছড়ায়?
সেথা কি এমনি ধারা কুসুমে সুষমা-ভরা
সেথাও কি মেশামিশি তরু লতিকায়?

সেথা কি মর্ম্মের রাগে জড়েতে চেতনা জাগে,
সেথা কি নির্ঝর ঝরে পাষাণের গায় !
ভালবেসে সেথা কিগো আপনা বিলায় !—
সেথা হ'তে একবার ডাক-না আমায় !
ওগো তুমি কোন্ অচেনায় !
সেথাকার লতাপাতা এমনি ত' সুশোভিতা ?
বনভূমে শেষ রবি এমনি লুকায় ?
নীল নভে রাঙা মেঘ খেলিয়া বেড়ায় !
সেথাকার বেলাভূমি তটিনী তো ধাই চুমি ?
সেথা তুমি, তটিনী কি সাগরে মিশায় ?
সেথা হ'তে একবার ডাক-না আমায় !
জনম জনম ধরে, বসে আছি আশা ক'রে,
একবার আসিবে গো ডাকিবে আমায় !
নিরাশে আঁধার হেরি, আরো বল কত দেরী
সার্থক করিতে মোরে তব মহিমায় ?
প্রাণেশ ! করুণা করি ডাক হে আমায় !

শ্রীমতি প্রতিভাসুন্দরী দেবী ।

আগমনী ।

আজি এ শশাঙ্ক কেন সেজেছে নবীন সাজে,
আজি এ সলিলে কেন পুলকে সরোজ রাজে !
আজি এ শেফালি কেন ফুটেছে সোহাগ-ভরে,
আজি এ যূথিকা কেন সাজিতেছে থরে থরে !
আজি এ বহিছে কেন নিরমল সমীরণ !—
আজি এ উষার কেন নব নব আভরণ !
আজি এ প্রভাতে কেন মৃদু কল কণ্ঠ-রব !—
আজি এ ভারত-ভূমি কিসে এত অভিনব ?
আজি এ শিশির কেন ঝরিছে নবীন বেশে ?
আজি এ বালক কেন ছুটিতেছে হেসে হেসে !
আজি এ লাবণ্য-রাশি কে দিয়েছে প্রকৃতিরে ?
আজি এ সুরসী কেন ভরেছে নির্ম্মল নীরে ?
আজি এ হৃদয়ে কেন উথলে আনন্দ রাশি !
আজি এ বদনে কেন ফুটেছে প্রীতির হাসি !
আজি এ মন্দিরে কেন বাজিছে বাজনা-বাঁশি ?
আজি এ অবলা-কুল করে কেন হাসাহাসি ?
আজি কি এসেছে ভবে শারদীয় শুভ দিন ?
তাই কি দেখিতে পাই এ সকল শুভচিন্ !
বুঝেছি এসেছে সেই শারদীয়া আগমনী !
তাইতো শুনিতে পাই মধুর মঙ্গল-ধ্বনি ।

কুমারী পূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী ।

বিধির বিধি ।

(উপন্যাস)

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে তিন চার ক্রোশ দূরে ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম ; নামটি ও তেমনি—'ফুরফুরেপাড়া ।' মহেশ চট্টোপাধ্যায় গ্রামের একজন মান্যবর অধিবাসী । ক্ষুদ্র গ্রামখানির শূদ্র ভদ্র সকলেই দরিদ্র চাটুয্যে ম'শায়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে । পল্লী-গ্রামে এখনও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য ধন-দৌলতের কোন আবশ্যক হয় না ; এক মাত্র চরিত্রগুণেই তাহা লাভ হইয়া থাকে ।

চাটুয্যে-ম'শায়দের বংশে পূর্ব্বকালে কন্যার

বিবাহে অর্থ-গ্রহণের প্রথা ছিল; তাঁহার পিতামহও অসঙ্কুচিত চিত্তে এ-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহেশচন্দ্রের পিতাঠাকুর এ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন; এবং নিজের দুই কন্যার যথারীতি পণপূণ দিয়া তাঁহাদিগকে কুলীনে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। আজ চাটুয্যে ম'শায়ের নিজের কন্যার বিবাহ উপস্থিত; আর্থিক বিষয়ে সচ্ছলতা না থাকিলেও তিনি নিজে এতদিনে যা' কিছু অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সব একত্র করিয়া কন্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

প্রভাবতী যদিও তাঁহার একমাত্র কন্যা, তবু মনের মত পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়ে একটু বড়ই হইয়া পড়িয়াছিল। মাতাপিতা বলিতেন তাহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র; কিন্তু প্রতিবেশীরা বলাবলি করিত যে, প্রভার ১৬ বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। প্রভা একে সুন্দরী, তাহাতে বয়সের গুণে তাহাকে একখানি দেবী-প্রতিমার মত দেখাইত। আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশের রাশি সে সৌন্দর্য্য শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

নৈহাটির হরিশ ভট্টাচার্য্যের পুত্রের সহিত প্রভার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। পত্র করিবার সময় চাটুয্যে-মহাশয় স্বয়ং গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে পাত্রটিকে স্বচক্ষে দেখা ঘটে নাই। কারণ সরকারী কার্য্যে ছুটি না পাওয়ায় বিবাহের পূর্ব্বে তাহার উপস্থিত হওয়া ঘটিয়া উঠিল না; অগত্যা বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেই তিনি জামাতার আশীর্ব্বাদ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

একে ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহের ক্রিয়া-কর্ম্ম; সুতরাং, আয়োজনও তেমনি সামান্য ধরণেরই হইয়াছিল। তবে পাত্রটি শিক্ষিত ও উচ্চ-বেতনভোগী হওয়ায় বরপক্ষের বিলক্ষণ মোটা দাবীতেই চাটুয্যে-মহাশয়কে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

(২)

হরিশ ভট্টাচার্য্য শুভক্ষণ দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রওনা হইলেন বটে, কিন্তু সে শুভক্ষণের ফলটা বিলক্ষণই অশুভভাবে ফলিয়া গেল। নির্ব্বিঘ্নে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, সবই পাওয়া যায়। চাটুয্যে-মহাশয়ের লোকাভাব, সুতরাং বরকর্ত্তার উপরই একেবারে গ্রাম পর্য্যন্ত আসিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা ছিল; জিনিষপত্র দেখিয়া শুনিয়া লইয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ভৃত্যদের উপর গাড়ী করিবার আজ্ঞা দিবেন, এমন সময় পুত্র সুধীর বলিল, "বাবা, আমার আগে একটু জল আনিয়ে দেন।" জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্রে সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "এ-সময় এখান-কার পুকুরের জল কাদা-গোলা খেলে অসুখ হ'তে পারে। তার চেয়ে ডাব আনাই, খাও।" তাঁহার আদেশ মত অনেকগুলি ডাব কেনা হইল। সুধীর এক নিঃশ্বাসে তিন-চারিটা ডাবের জল পান করিয়া ফেলিল। কর্ত্তা 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এক সঙ্গে খালি পেটে অতটা জল খায়!"

বাড়ীতে একটু দুধ ও ফল মাত্র আহার করিয়া সুধীর বাহির হইয়াছিল; সুতরাং,এখন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুইই বিশেষভাবে প্রবল হইয়াছিল। পিতার স্নেহের আশঙ্কা ব্যর্থ হইল না; ডাবের জল উদরস্থ হওয়ার অলক্ষণ

পরেই বমি হইয়া গেল। দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। উদ্বেগ ভীতিতে পরিণত হইতে না হইতে, রীতিমত-ভাবে ভেদবমি দেখা দিল ও ভীষণ কলেরা নিজের নির্মম আক্রমণ ঘোষণা করিয়া দিল। সকলে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না; পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরও ভেদ আরম্ভ হইল।

সঙ্গের বরযাত্রীরা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' কথার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তবে সেকালে তীর্থ-সঙ্গী পথে পীড়াগ্রস্ত হইলে অন্যান্য যাত্রী একমালা জল দিয়া তাহাকে গাছ-তলায় ফেলিয়া রাখিয়া যেমন অগ্রসর হইত, তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সদাশয়তা দেখাইয়া বরযাত্রীর দল রোগীদিগকে হাসপাতালে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের বলিবার বা করিবার কিছুই ক্ষমতা ছিল না। রোগীদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইলে ডুলি বা পাল্কী আবশ্যক; কিন্তু পাল্কী কোথায় পাওয়া যায়? নিকটে একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "ভাড়া তো পাওয়া যাবে না, তবে এই কাছেই রায়দের বাড়ীতে একখান্ পাল্কী আছে বটে! আচ্ছা, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন্, আমি সেটা আন্‌তে পারি কি-না দেখি।"

রায়েরা কাঁচড়াপাড়ায় পুরাতন ধনিবংশ, কিন্তু এখন 'তালপুকুর' নাম মাত্রই আছে। পূর্ব্বের হাতী-ঘোড়া-পাল্কীর অবশিষ্ট দুই একখান তঞ্জাম্ ও পাল্কী ধূলামাখা আধ-ভাঙ্গা অবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে, এবং লক্ষ্মীর অভাবে তাঁহার বাহন-প্রকৃতিধারী বংশধরেরা উপযুক্ত সঙ্গী-সাহচর্য্যে ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিতে-ছিল। দোকানী পাল্কীর জন্য একেবারে স্বয়ং বাবুর নিকট আবেদন লইয়া উপস্থিত হইল। বাবু বলিলেন, "বিয়ের বরযাত্র! কোথাকার হে?" দোকানী উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি তো তা বল্‌তে পারি না, আপনারা যদি কেউ যান্ তো সব জেনে আস্‌তে পারেন।" বাবু পারিষদ্‌দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা! বাসর-শয্যা একেবারে চিতা-শয্যা হ'ল হে! চল না দেখে আসি।—ওহে পাল্কী নিয়ে যাবে কে? আমরা তো নিয়ে যেতে পারি নে!"

"আজ্ঞে আমি এখনি লোক আন্‌ছি" বলিয়া দোকানী অবিলম্বে জন-কতক বাহক ডাকিয়া আনিল। কাঁচড়াপাড়ার কারখানার কল্যাণে লোকের কোন অভাব ছিল না।

রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া বরযাত্রীরা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদ লোক্যাল্ একটু পরেই যাইবে; সেই সময়টুকুর মধ্যে রায়-বাবুদের দল তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বরযাত্রীরা তাঁহাদের ভদ্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘটনার বিবরণ সবিশেষ জানাইয়া বলিলেন, "এখন কন্যাকর্ত্তাকে আপনারা যদি এ-সংবাদটা কোন রকমে দিতে পারেন, বড় ভাল হয়।" "তা আর কি! এখনি লোক পাঠাচ্ছি," বলিয়া বাবুরা ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন। জনৈক বন্ধুর প্রতি চাহিয়া হরিগোপাল বলিল, "ওহে শশী! ব্যাপারটা শুন্‌লে তো?" শশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শুন্‌লাম্ বাই কি! কি যে ভগবানের খেলা, তিনিই জানেন। আমার এত বিয়ের সাধ, তা' টাকার জন্যে এ

জন্মে বিয়েও হ'ল না, মরণও হ'ল না! ও বেচারি অত টাকা-পয়সা পেয়ে বিয়ে কর্‌তে গেল, মরণ এলেন বিনা ওরই কাছে।" হরি-গোপাল বলিল, "এইবার তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে বলেই ভগবান্ ওকে মারছেন,এটা আর বুঝ্‌লে না?" শশী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? কুলে মানে, গুণে জ্ঞানে আমি কি ধনুর্দ্ধর তা বুঝি মনে নেই? আর তার মেয়ের কথা শুনেছ তো? মহেশ চাটুয্যে সেই মেয়ে আমায় দেবে?" হরি গোপাল বলিল, "না, না, আমি সে কথা তো বলি নি। আমি বল্‌ছি যে তাঁর মেয়ের একটি বর ঠিক্ করে আমরা নিয়ে যাই চল না! তার পর স্বর্ণ-রৌপ্য যখন 'দরানি' হয়ে যাবে, তখন তার মালিক হ'তে পারলেই তো, সেই টাকায় তোমার বিয়েটা হয়ে যায়; এদিকে ব্রাহ্মণেরও জাত-রক্ষা করা হয়।" শশী বলিল "তা যদি হয় তো কর্‌তে রাজী আছি; তবে তেমন পাত্র কোথা পাবে?" হরিগোপাল উত্তর দিল, "তাও ঠিক্ আছে, আমি সে জোগাড় কর্‌ব। এখন তোমায় যা' কর্‌তে বলি, কর্‌বে এস, বিলম্বে কার্য্যহানি হয়ে যেতে পারে।"

রাত্রি নয়টার সময় বিবাহের লগ্ন ছিল; পাঁচটার সময়েই বরপক্ষের সকলের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। চাটুয্যে-ম'শায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। তিনি কুটুম্বের অভ্যর্থনার আয়োজনের মধ্যে এক এক বার পথে বাহির হইয়া পথ দেখিতেছেন। ৬টা বাজিয়া গেল তবু বরপক্ষ পৌঁছিলেন না দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক-জন বাহির হইতে ডাকিল, "চাটুয্যে-ম'শায়! বাইরে আসুন, কুটুম-বাড়ীর লোক এসেছে।"

চাটুর্য্যে-ম'শায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন বর বা বরযাত্রী কেহই আসেন নাই; কেবল পুরোহিত ও তাঁহার মাত্র একজন সঙ্গী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন তাহা দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর কই? বৈবাহিক কই? আপনাদের এত বিমর্ষ বোধ হচ্ছে কেন, বলুন তো?"

পুরোহিত-ঠাকুর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অতি দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার ভাবী বৈবাহিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন।" চাটুয্যে-ম'শায় মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! হা ভগবান্! দরিদ্রের এ কি করিলে?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "অত কাতর হবেন না; যার কন্যাদায়, তার এ বিপদ্ যে আমাদের বিপদ্ অপেক্ষাও অধিক, আমরা তা' বুঝি; সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি গুটি-কয়েক সর্ত্তে আবদ্ধ হ'ন তবে আজ রাত্রেই বিবাহ হ'তে পারে।" চাটুয্যে-ম'শায় বলিলেন, 'বলুন্।' তিনি বলিলেন, "পীড়িত পিতাকে ত্যাগ করে সুধীর তো কিছুতেই বিবাহ কর্‌তে আস্‌তে রাজী নয়,তবে আপনার বিপদ্ স্মরণ কর্‌রেই অনেক কষ্টে আমরা এই সর্ত্তে তাকে রাজী করিয়েছি যে সে যখন বিয়ে কর্‌তে আস্‌বে, আপনার বাড়ীতে কোন লোকজন কি গোলমাল কিছু থাক্‌বে না; কেন না তা'র মনের যেরূপ অবস্থা তা'তে ও সব মোটেই তা'র ভাল লাগ্‌বে না। তার পর কন্যাকে যে সব অলঙ্কার আপনি দিবেন্, তা' এখন পণের টাকার সঙ্গে তারই হাতে দেবেন। সে বিবাহ করে আজ রাত্রেই নৈহাটি চ'লে যাবে। তার

পর কর্ত্তা আরাম হ'য়ে উঠ্‌লে আপনার কন্যাকে পরমাদরে গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনাকে বল্‌তে লজ্জা নেই, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের হাত একেবারে শূন্য। ছেলের বিবাহের এই টাকাটাই তাঁর উপস্থিত খরচের সম্বল; সুতরাং এই বিপদের সময় ওটা আপনাকে তখনই দিয়ে দিতে হবে। যদি এতে আপনি রাজী হন, তা'হলে আমি আর এই পুরোহিত-মহাশয় বর নিয়ে আস্‌তে পারি। তবে এখন আর ট্রেনের সময় তো নেই; সুতরাং, আমরা মোটরে করে বর নিয়ে আস্‌বো। কাজেই রাত্রি কিছু গভীর হবে। আমরা কাঁচড়াপাড়ায় একখান মোটরের সন্ধান পেয়েছি বলেই যথাসময় গিয়ে পৌঁছুতে পারব।"

মহেশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, "আচ্ছা তাই আস্‌বেন্। জগদম্বার ইচ্ছাকে কে রোধ করতে পারে ?"

"তবে এখন আসি" বলিয়া দুই জনে বিদায় লইলেন। মলিন বদনে অন্দরে প্রবেশ করিয়া চাটুয্যে-ম'শায় গৃহিনীকে ডাকিয়া সব কথা বলিলেন। বিবাহের আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত ভবন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

৩

শশীকে বিদায় দিয়া হরিগোপাল নিজের সাইকেল্ লইয়া জাগুলির দিকে ছুটিল। জাগুলিতেও আজ একটি ধুমধামের বিবাহ ছিল। স্বয়ং হরিগোপালও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল। বিবাহ-বাটীতে আত্মীয়তা-সম্পর্কে সিনহাটির জমীদার-পুত্র সুরেন্ কাল হইতে আসিয়া রহিয়াছে; সহপাঠিত্ব-প্রযুক্ত হরিগোপালের সঙ্গে সুরেনের বিশেষ আলাপ ছিল; হরিগোপাল তাহারই নিকট গিয়া হাজির হইল।

সন্ধ্যার পরেই জাগুলির বর বাহির হইবে। সন্ধ্যাও প্রায় হয়। বন্ধুরা সকলে বর সাজাইবার ভার লইয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছে। যে বন্ধু বিবাহিত, তিনি ইহার মধ্যে বিবাহিত জীবনের অম্ল-মধুর রসের পরিচয় দিয়া বন্ধুকে ভবিষ্যৎ পথে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন, আর অবিবাহিত বন্ধুগুলি তাহাতে মুখে অতিরিক্ত মাত্রায় সায় দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু মনে মনে বন্ধুর প্রাপ্য সৌভাগ্যের সহিত নিজেদের ভাগ্য তুলনা করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। "না খেয়ে পস্তানো" অপেক্ষা খেয়ে পস্তানো" অধিকতর প্রবল যুক্তিসম্পন্ন। জ্যৈষ্ঠমাস ফুলের মেলা, বেলা মল্লিকার গন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে; যুবকের চিত্তে ফুলের গন্ধ প্রেমের স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

এমন সময় হরিগোপাল গিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সুরেনের স্কন্ধস্পর্শ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া সুরেন বলিল, "কই হে, কাপড়-চোপড় তো কিছুই পরে আস নি। এই বেশে বরযাত্রায় যাবে না কি ?" হরিগোপাল একটু নিম্নস্বরে বলিল, "সে পরে হবে; এখন তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি, আমার একটা কথা শুনতে হবে।" সুরেন বলিল, "এখানে বলবে ?" হরিগোপাল বলিল, "না, আমার সঙ্গে একটু বাগানে চল।" সুরেন ও হরিগোপাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাগানে একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া হরি-

গোপাল সুরেন্‌কে লইয়া বসিয়া বলিল, "আমিও তোমার এক জায়গায় বিয়ের নিমন্ত্রণেই নিয়ে যেতে এসেছি।" বিস্মিত সুরেন বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কোথায় হে! তোমার নাকি?" হরি বলিল, "না-তোমার—।" হাসিয়া সুরেন বলিল, "ভাল! তা হলেও বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হোত না। এই হাসি-বাঁশীর মধ্যে মনটা বিয়ে বিয়ে কর্‌চে বটে!" "করবে তো চল না। দিব্যি পরীর মত মেয়েই পাবে।" আশ্চর্য্য হইয়া সুরেন বলিল, "কি বল্‌চ হে তুমি! পাগল হয়ে গেলে না কি?" হরি বলিল, "না ভাই, পাগল টাগল নই, এখন যে কথা বল্‌তে এসেছি শোন। আজ আমার একটি জ্ঞাতি-খুড়োর মেয়ের বিয়ে ছিল। তা' বিপদের কথা তোমার কি বল্‌ব, ভাবী জামতা ও তার পিতা দুজনেই কাঁচড়া-পাড়ায় এসে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। অবস্থা এমন যে, এতক্ষণ প্রাণে আছে কি নেই। এ-দিকে খুড়োর মেয়েটিও ষোল পার হয়। সুতরাং ভেবে দেখ তাঁর জাত যায়; তার ওপর গরিব অনেক কষ্টে বিয়ের পুঁজি পাটা করেছে। একবার খরচ-পত্র হ'য়ে গেলে আবার জোগাড় করে বিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। সুতরাং, আজ রাত্রিতেই যেমন করে হোক্ তাঁর মেয়ে পার করতে হবে।" থামিয়া হরিগোপাল একবার সুরেনের মুখের প্রতি চাহিল; সুরেন বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাই তুমি আমায় ধর্‌তে এসেছ? হরিগোপাল! তুমি কি ভুলে গেছ, আমি কার ছেলে!!" "হরি-গোপাল তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, তুমি ভুল বুঝেছ, সুরেন! আমি তোমায় ধর্‌তে আসি নি, ভাই! আমার কাকা অতিদরিদ্র ব্যক্তি। আর তুমি জমীদারের একমাত্র সন্তান। আমরা এমন উন্মাদ হই নি যে, সত্যিই বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌তে যাব! তার ওপরে তোমার বাবা—আচ্ছা সুরেন! তিনি কি এখনও তেমনি রাগী আছেন? তোমরা এখনও তাঁর তেমনি প্রত্যেক আদেশ মেনে চল?" সুরেন বলিল, "খুব চলি; আর জেনে রেখো চিরদিনই চল্‌ব; হরিগোপাল, বাবার কথা আমার কাছে সাবধানে ক'রো। তিনি আমার পরম পূজ্য।" হরিগোপাল বলিল, "রাগ ক'র না ভাই! আমি কেবল জিজ্ঞাসা করছিলাম। আর তারও একটু কারণ ছিল, সেই কারণেই তাঁর কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এসেছি। জানতো আমরাও তাঁকে কি-রকম ভয় করি।" সুরেন বলিল, "আচ্ছা বল।"

হরিগোপাল বলিল, "ভাতশালায় তোমা-দেরই প্রজা রামতারণ বাঁড়ুয্যের ছেলের সঙ্গে কাকা একবার তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রামতারণ বাবুর অসম্ভব প্রার্থনায় কাকাকে নিরস্ত হ'তে হয়। আজ যদি সেই ছেলেটিকে পাওয়া যায়, তো এ বিপদ্ হ'তে ভাল রকমে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে।" সুরেন্ বলিল, "তা তোমরা তাঁকে গিয়ে এ-কথা বল গে।" "তা তো বল্‌ব, কিন্তু সে যে রকম অর্থগৃধ্নু, কাকার গরজ দেখ্‌লে ভিটে-মাটি গ্রাস না করে রাজী হবে বলে বোধ হয় না; সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি, তুমি যদি একবার অনুগ্রহ করে গরিবের কুটিরে গিয়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হও, তা হ'লে অন্ততঃ তোমাদের খাতিরেও যদি সে একটু মানুষের মত ব্যবহার করে।" সুরেন বলিল, "আমি কিন্তু রামতারণ

বাবুকে যতদূর জানি, তিনি এত মন্দ লোক বলে তো আমার বোধ হয় না।” হরি গোপাল বলিল, “সে তোমাদের সঙ্গে কি আর ও-রকম ব্যবহার করে যে, বুঝ্‌বে? সেই জন্তেই তো তোমায় উপস্থিত হ’তে বলছি। তা হ’লে—কি বল, যাবে?

সুরেন। “কিন্তু এরা ছাড়্‌বে কি?”

হরি। তুমি যদি যাও, আমি মত করিয়ে নিচ্ছি।—আচ্ছা, তুমি বোস, আমি জিজ্ঞাসা ক’রে আসি।

হরিগোপাল চলিয়া গেল। সুরেন গাছ-তলায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “বেশ যাহোক্! একজনের বিয়ে দেখ্‌তে এসে আর একজনের বিয়ে দিতে যাচ্ছি। অপরংবা কিং ভবিষ্যতি!” একটু পরেই হাসিমুখে হরিগোপাল আসিয়া হাজির হইল, বলিল, “চল হে সুরেন, তুমি আজ আমারই!” হাসিয়া সুরেন বলিল, “বেওয়ারিস মাল যে টেনে নেয় তারই বই কি!”

হরি। আস্‌ছে গো আস্‌ছে, জবরদস্তি ওয়ারিসান শীগ্‌গীরই আস্‌বে। তার পর, তোমার মোটরখানা কোন্ দিকে?”

সুরেন। সে তো আজ পাবার যো নেই! বর যে তাতেই যাবে।

“এঃ সব দিকেই ভায়া আমার কেঁচিয়ে আছেন! চল, তবে দেখি গে বিশুর মোটর-খান্ যদি পাই! হা রে কল্‌কাত্তা!”

দু’জনে আগুলি হইতে কাঁচড়া-পাড়া অভিমুখে রওনা হইল।

৪

গভীর-রাত্রে চাটুয্যে-ম’শায়ের দ্বারের কাছে মোটর আসিয়া লাগিল। গ্রামে তখন আর মানুষের সাড়া নাই, সকলেই নিদ্রামগ্ন; বিবাহ-বাড়ীও ভোঁ-ভোঁ! চাটুয্যে-ম’শাই দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। ততক্ষণে তিনটি মাত্র আরোহী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। দুজনের সহিত চাটুয্যে-ম’শায় পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া বুঝিলেন এই বর। এত যে মনের কষ্ট তাহা পাত্রের প্রতি চাহিয়া নিমেষে সব চলিয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন, “প্রভাত আমার একি ভাগ্য! এ যে উমারাণীকে লইতে স্বয়ং শিব আসিয়াছেন!” আনন্দে তাঁহার চ’খে জল আসিয়া পড়িল। পরম আদরে তিনি সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একস্থানে বরের আসন সাজান হইয়াছিল। সেখানে এখন লোকজন কেহই নাই। উপস্থিত যিনি বরপক্ষের অভিভাবক, তিনি বলিলেন, “রাত অনেক হইয়াছে, শীঘ্র ফিরিতে হইবে; একেবারে সম্প্রদানের স্থানেই চলুন্।” সুরেন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তাঁরা কই? এখনো আসেন নি নাকি?” উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিল, “চুপ কর না, সবই এখুনি দেখ্‌তে পাবে!”

সকলে পৃথক্ পৃথক্ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। পুরোহিত সঙ্গে আনীত ফুলের মালা বাহির করিয়া সুরেনের গলায় পরাইয়া দিল। হাসিয়া সুরেন সঙ্গীকে চুপি চুপি বলিল, “আমাকেই যে বর করে তুল্‌লে হে!”

এ-দিকে চাটুয্যে-মশা’য়ের অত্যধিক বিনয়-আপ্যায়নে সুরেন মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; ভাবিতেছিল, ‘যেমন করিয়া হোক্ এ ভদ্র-লোকের আজ মান

বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু বর পক্ষ যে আসিলে হয়। নিদ্রালসেই হোক্, কি চিন্তাভারেই হোক্ সুরেন যখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হইয়াছিল, সেই সময় দেখিল পট্টবস্ত্রাবৃতা শুধু পুষ্পহার ও বলয়মাত্র-শোভিতা প্রভাবতীর হাত ধরিয়া চাটুয্যে-ম'শায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সুরেন বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া আবিষ্টের মত সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এত মুগ্ধ এত তন্ময় যে, দৃষ্টিকে যে ফিরাইতে হইবে, তাহাও তাহার মনে পড়িল না। চাটুয্যে-ম'শায় সুরেনের সম্মুখের আসনে কন্যাকে বসাইলেন। স্থানের গুণই হোক্ বা ভাগ্যের ফলেই হোক্, প্রভাবতীর দেহের জ্যোতিঃস্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধের মত সুরেন স্থান কাল বা পূর্ব্বাপর ঘটনা সমস্তই বিস্মৃতপ্রায়; তাহার মন ও দৃষ্টি সুন্দরীর বদন-সংলগ্ন হইয়া রহিল! অপর দুইজন সঙ্গী মনে মনে হাসিতে লাগিল।

বিবাহ-কার্য্য আরম্ভ হইল। যখন বর-কন্যার শুভদৃষ্টির জন্য প্রভার মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেওয়া হইল, তখন সে অপরূপ সৌন্দর্য্য-সুধা সুরেন লুব্ধের মত পান করিতে লাগিল। সুরেনের পূর্ব্বপরিহিত পুষ্পমাল্য অপসারিত করিয়া উভয়ের মাল্য-বিনিময় হইল। পরে যখন উভয়ের করযুগল পুষ্পমাল্যে বন্ধন করিয়া পিতা সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন সুরেন যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। সে সজোরে হাত টানিবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"একি কচ্ছেন!" চাটুয্যে-ম'শায় অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা! আজ দরিদ্রের জাতধর্ম্ম রক্ষা করিলে, ঈশ্বর তোমায় রাজ-রাজেশ্বর করিবেন। প্রভা চিরদিন তোমায় দাসীর দাসী হ'য়ে থাকবে।"

সুরেনের হাতের মধ্যে প্রভার উষ্ণ হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। পুষ্প-বেষ্টনী তখনো উভয়ের হস্তকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুরেন্ ভাবিল—ভ্রমবশতঃই হোক্, চাতুরীতেই হোক্, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, যে রত্ন আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে, সে যে বহু সাধনার প্রাপ্য ফল। কোন্ পাষণ্ড এ নিধি পাইয়াও হেলায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? কিন্তু তবুও সুরেন পাষণ্ড না হইলেও ভাগ্যহীন। তবুও এ রত্ন তাহার ধূলাতেই লুটাইয়া দিয়া যাইতে হইবে! হা ভগবান্! যে চন্দনে হৃদয়ের দারুণ দহন-জ্বালাও শীতল করে তাহাকে এ কি ভুজঙ্গে বেষ্টিত করিয়া সম্মুখে ধরিলে! সুরেন কেমন করিয়া এ অতলোদ্ভূতা লক্ষ্মীকে গৃহে তুলিবে!! সুরেন ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া প্রভাবতীর মুখের উপর স্থাপিত করিল। পিতার কথায় তাহার চক্ষে অশ্রুজল টল টল করিতেছে; ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিতেছে।

এই সময় সহসা এক বীভৎস কাণ্ড ঘটিল। সুরেনের সঙ্গী প্রথম ব্যক্তি চাটুয্যে-ম'শায়ের ঠিক্ পশ্চাৎ দিকে গিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দাঁড়াইল ও পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিল—"থালার উপরকার অলঙ্কার ও টাকা উঠাইয়া লও।" পুরোহিত থালা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যে ম'শাই বলিলেন, "এখনও বিবাহ শেষ হয় নাই, এর মধ্যে আপনি ও কি করিতেছেন?"

"আমাদের কাজ সব সম্পূর্ণ হইয়াছে," বলিয়া পুরোহিত গমনের জন্য পা বাড়াতেই সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া সুরেন দাঁড়াইয়া

উঠিল। "খবরদার, এক পা নড়্‌লে মজা টের পাবে। রাখ বলছি সব!" বলিয়াই সে সজোরে দুর্বৃত্তের গলা টিপিয়া ধরিল। চাটুয্যে-ম'শাই "মা জগদম্বা, তোমার মনে এই ছিল" বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে পিস্তলধারী ছুটিয়া আসিয়া সুরেনের মাথায় সবলে আঘাত করিল। হঠাৎ সজোরে আঘাত পাইয়া সুরেন ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দুর্বৃত্তেরা টাকা ও গহনা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন বাহির হইতে আর একজন বলিল, "ওকেও নিয়ে আয়।" সুরেনের মূর্চ্ছিত দেহ দুইজনে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া গেল। প্রভাবতী পিতার কোলে মুখ লুকাইতে গিয়া দেখিল, সারাদিনের অনশন-ক্লিষ্ট দুঃশ্চিন্তা-পীড়িত পিতা এই আকস্মিক বিপদে তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিবাহের কন্যা ঘোমটা ফেলিয়া পিতৃ-সেবায় ব্যস্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

যোশীমঠ বা জ্যোতির্ধাম।

যোশীমঠটী জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের স্থান। ইহা গাড়োয়ালের পাইন-খণ্ডে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ছয়শত। যোশীমঠ অলকানন্দার বামতটে বিরাজিত। এখানকার বাটীগুলি ধূসরবর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। বদ্রিনাথের মন্দিরের রাওয়াল ও অন্যান্য পূজারিদিগের বাটীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে লোকেরা অক্টোবর মাস হইতে মে মাসের মধ্য সময় পর্য্যন্ত বাস করে। এই সময়ে মন্দিরের রাস্তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এখানকার মন্দিরটীতে নরসিংহের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দিরটী দেখিলে বাটী বলিয়াই ভ্রম হয়। মন্দিরটী তাম্র-ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানকার যাত্রীদিগের জলের অভাব হয় না। পর্ব্বত-বিনিঃসৃত জলপ্রপাত লোকের জলকষ্ট নিবারণ করে। প্রবাদ এই যে, নরসিংহের মন্দিরে প্রহ্লাদ তপস্যা করিয়াছিলেন। চত্বরের এক দিকে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। মধ্যে বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহার পরিসর ৩০ বর্গফিট। অনেক মন্দিরই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। ভূমিকম্পই এই দশা সঙ্ঘটিত করিয়াছে। বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং নবদেবীর মন্দিরও ভূমিকম্প হইতে পরিত্রাণ পায় নাই; তবে ইহাদিগের হানি অতি সামান্যই হইয়াছে। বিষ্ণুর মূর্ত্তিটী কৃষ্ণপ্রস্তর-দ্বারা বিনির্ম্মিত এবং তাহার শিল্পনৈপুণ্যও উত্তম। বিগ্রহটী ৭ ফিট উচ্চ। চারিজন স্ত্রীমূর্ত্তি একটী চত্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিষ্ণুর বিগ্রহকে ধারণ করিয়া আছে। অপর একটী পিত্তল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে দুইটী পক্ষ সংযোজিত দেখা যায়। মূর্ত্তিটী যজ্ঞোপবীতধারী। বোধ হয় ইনি বিষ্ণুর বাহন গড়ুর। গণেশের মূর্ত্তিটী ২ ফিট উচ্চ এবং তাহা সুন্দররূপে পালিশ করা।

যোশীমঠের অধিবাসিগণ পূজারী, বণিক্ ও কৃষক। এখানে একটী পান্থনিবাস, স্কুল ও চিকিৎসালয় আছে। শেষোক্তটী সদাব্রতদ্বারা পরিচালিত।

যোশীমঠে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, ভৃগী, ঋষি, সূর্য্য, দুর্গা, ধনদ এবং প্রহ্লাদকুণ্ড নামে খ্যাত। নারদ বিষ্ণুকুণ্ডে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন।

যোশীমঠে এককালে কত্তিযুরী রাজগণের প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহারা কোন কারণ বশতঃ তথা হইতে কত্তিযুরীতে চলিয়া আইসেন। কারণটী এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"বাসদেবের জনৈক বংশধর জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যান। এমন সময় বিষ্ণু নরসিংহের আকারে আবির্ভূত না হইয়া মনুষ্য মূর্ত্তিতে রাণীর নিকটে আগমন করতঃ আহার প্রার্থনা করেন। "রাণী তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান। ভোজনের পর তিনি রাজার শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। রাজা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে স্বীয় শয্যায় শয়িত দেখিয়া তরবারি দ্বারা তাহার হস্তে আঘাত করেন। অমনি আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির না হইয়া দুগ্ধ বাহির হইতে লাগিল। রাজা তদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া রাণীকে সমস্ত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেন। রাণী বলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা।' রহস্য বুঝিতে না পারিয়া রাজা নরসিংহের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া নরসিংহ-মূর্ত্তিতে রাজাকে বলেন, 'তুমি জ্যোতির্ধামে না থাকিয়া কত্তিযুরে বাস কর। স্মরণ রাখিও, তুমি যে আঘাত-দ্বারা আমার হস্তে ক্ষত করিয়াছ, তাহা আমার মন্দিরের বিগ্রহে দেখিতে পাইবে এবং যখন বিগ্রহটী পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং হস্তটী আর থাকিবে না, তখনই বুঝিবে যে তোমার বংশ পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে।' এই বলিয়া নরসিংহ অদৃশ্য হইলেন।"

শঙ্করাচার্য্য যোশীমঠে কত্তিযুরী রাজার রাজত্ব কালে আগমন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কেমন করিয়া লিখিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয় মিসেস্ ষ্টো তাহা জানিতেন না। তিনি যাহা জানিতেন ও দেখিয়াছিলেন তাহাই প্রাণের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি দাসদিগের মধ্যে থাকিয়া পালিত হইয়াছিলেন, দাস-সন্তানদের সহিত আপনার ভাই-বোন-জ্ঞানে ক্রীড়া করিতেন; তাহাদের দুঃখে শৈশবেই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, সেই সময় হইতেই তিনি মনে মনে তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন। এখন সেই আশা ফলবতী হইল। নিজে না কাঁদিতে জানিলে পরকে কাঁদান যায় না। তাঁহার নিজের বক্ষের রক্ত দিয়া

রঞ্জিত এবং অশ্রুজলে সিক্ত "টমকাকার কুটীর"-নামক পুস্তকখানি জগতের লোককে কাঁদাইয়াছে।

তাঁহার দীনহীনের প্রতি স্নেহ কেবল ঐ একখানি পুস্তক-রচনাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই; তিনি শত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে গমন করেন। তথায় বিভিন্ন রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে অভ্যুত্থিত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পান। তিনি এই প্রকারে প্রায়ই বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, আত্মরচনা পাঠ করিয়া জনসাধারণকে বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলিলেন। সেই করুণাময়ীর করুণা-বর্ষণের ফলে লোকে তদ্ভাবে অতীব অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে ঐ জঘন্য দাসত্ব-প্রথা রহিত করিবার জন্য চিৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, জনসাধারণের উত্তেজনা ক্ষণিকের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সেই-জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া অনবরত উত্তেজনামূলক রচনা লিখিয়া লোকের বিশ্ব-প্রেমরূপ প্রদীপে তৈল যোগাইতে লাগিলেন।

সে প্রদীপ আর নিবিল না। তাহার উজ্জ্বল আলোক সমাজের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিয়া, মানবের মন পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিল। স্বার্থপরতা সেই আলোকে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গেল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মিসেস ষ্টৌ, "টেল্ অব্ দি ডিস্‌ম্যাল্ সোয়াম্প্"-নামক পুস্তক প্রচার করেন। দাস-প্রথাই যে সমাজের অবনতির একটী প্রধান কারণ, ইহাই তিনি ঐ পুস্তকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন।

এই সময় কয়েকখানি সংবাদ-পত্র বাহির হইল। মিসেস্ ষ্টৌর ভ্রাতা হেন্‌রি ওয়ার্ড্ উক্ত পত্রিকাগুলির প্রত্যেকটীর সম্পাদক-দিগের অন্যতম ছিলেন। সুতরাং ঐ পত্রিকা-গুলিতে তাঁহার গল্প লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় তিনি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; উহাদের মধ্যে মিনিষ্টার্ উইং-(Minister Wooing) নামক উপন্যাসটী অতি প্রসিদ্ধ। উহা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক "ষ্টৌ" অপর একটি স্থানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সপরিবারে ঐ স্থানে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন; তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া হার্ট্‌ফোর্টের বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

মিসেস্ ষ্টৌর পুত্র "কাপ্তেন্ ফ্রেড্যারিক্ বীচার ষ্টৌ" 'ওয়ার অব্ ইউনিয়ান্ *' যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। পুত্রের সত্বর আরোগ্য-লাভের আশাতেই তিনি ফ্লোরিডায় একটী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত তথায় বহুবৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পতি-বিয়োগ হয়। সেই সময় হইতে হার্টফোর্টের নিভৃত শান্তিপূর্ণ বাটীতে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। তিনি যখন বৃদ্ধাবস্থায় হার্টফোর্টে বাস করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে নিগ্রোদের চিন্তা অন্তর্হিত হয় নাই। তখনও তিনি সর্ব্বদাই নিগ্রোদের সহিত একত্র বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন, তাহাদের দুঃখে কাঁদিতেন এবং তাহাদের সুখে পরমানন্দ ভোগ

---

* দাসগণকে স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা করিবার ফলে যুক্তরাজ্যের দুই দলে এই যুদ্ধ বাধে।

করিতেন। এমন কি ভাই-স্তয়াজ্ঞানে মিশিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেন এবং তাহারা অত্যধিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন যে, তাহারা অদূর-ভবিষ্যতেই স্বাধীনতা লাভ করিবে। পুণ্যবতীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল।

তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই তারিখে মানবলীলা-সংবরণ করেন এবং তাঁহাকে "এণ্ডভোর"-নামক স্থানে তাঁহার স্বামীর সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। তাঁহার শোকে জগতে সমস্ত লোক বিশেষতঃ ক্রীতদাসগণ অতল শোকসাগরে মগ্ন হইল। শিশু জননীর মৃত্যুতে যেরূপ অস্থির হয়, স্নেহময়ী মিসেস্ ষ্টো'র মৃত্যুতে তাহাদেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ক্রীতদাসও শোক করিতে জানে, আর সে শোকের আন্তরিকতা ও গভীরতা পার্থিব অন্য কোন শোক অপেক্ষা হীন নহে!

রাণীর খেদ।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা রজনীকান্ত সেন]

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু'নয়ানে।
(ঐ) হংস-সারসকুল মলিন-মুখে
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে;
কি সোহাগে খে'তে দিত, অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
(ঐ) শুক, শ্যামা এ ক'দিন 'মা,' 'মা', ব'লে,
প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েছে তা'রা,
যেন জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, 'মা গিয়েছে কোন্‌খানে?'
নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার!
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

০　　　　　　　　১　　　　　　　　২´
II{পপা　ধা　র্রর্সা　র্সনা। র্সা　নর্সর্রর্রা　র্সণধা　পধা I গমা　মা　পধণা　ধা।
ঐ　যা　হা০　রা০　ই　রি০০ণ্　শি০০　শু০ চে০　য়ে　আ০০　ছে

৩　　　　　　　　০　　　　　　　　১
। পা　মধপা　গমপমা　গা। সা　নসা　গরা　গা। মগা　-মা　পধপা　ধা I
প　থ০০　পা০০০　নে　অ　শ্রু　ঝ০　রি　ছে০　০　সু০০　ধু

২´　　　　　　　　৩
I নর্সা　নর্সা　নর্সা　-র্রা। র্সনর্রা　ধণা　ধপা　ধা}II
কা০　ত০　র০　০　হৃ০০　০ন　য়া০　নে

অন্তরা।

০　　　　　　　　১　　　　　　　　২´
II{মজ্ঞা　মধা　ধণা　ধণা। ধা　ণধা　পা　ধা I না　না　নর্সর্রা　নর্সা।
ঐ　হং　স০　যা০　র　স০　কু　ল য　লি　ন০০　যু০

৩　　　　　　　　০　　　　　　　　১
। নর্সা　-র্রর্গা　-র্সর্গা　-র্রনর্সা। না　র্সা　র্রর্গা　র্রা। সা　মর্সর্রা　ণধা　ধা I
খে০　০০　০০　০০০　বু　ঝা　ই০　তে　না　বে০০　কি০　যে

২´　　　　　　　　৩　　　　　　　　০
I মা　মা　মপধা　-মপা। পা　-পমা　মা　-গমা}। র্সা　র্সণা　ণা　ধা।
বে　দ　না০০　০০　বু　০০　কেঁ　০০　কি　সো০　হা　গে

১　　　　　　　　২´　　　　　　　　৩
। পা　মপধপা　মা　গা I সা　-সন্সা　গরা　-া। গা　পক্ষপা　ণধা　ক্ষপা।
খে　তে০০০　দি　ত　অ　ন্ন০　ন০　য়　সে　অ০০　যু　ত০

০　　　　　　　　১　　　　　　　　২´
। র্সা　র্সর্গা　র্গর্রা　র্গা। র্মা　র্গর্মর্রর্জ্ঞা　নর্সা　র্সনর্সা I গা　মা　পা　ধণধণপা।
সে　মা০　কো০　থা　চ　লে০০০　গো০　ছে০০　ব　ড়　বা　থা০০০০

৩
। পা র্সনর্সা নর্সর্রণা ধপধা II
দি য়েOO প্রা ণেOO

সঞ্চারী।

০ ১ ২´
II{র্সর্স নর্সর্সা র্সনা র্রা। র্সা ধণা ধপা -ধা I মপা -ধপা মপা -ধা।
ঐ শু০ক্ শ্রা মা এ ক০ দি০ ন্ মা০ ০০ মা০ ০

৩ ০ ১
। মা -গা গরা -গা। পা মপমা গা পা। মা গমা ররা সা I
ব ০ লে০ ০ প ড়েOO ছে উ মা র০ বু কে

২´ ৩ ০
I সা সা গমা -া। পক্ষা -পা ক্ষপা -ক্ষপা}।{পা পা নধা না।
সো হা গে০ ০ গ০ ০ লে০ ০০ চ লে গে০ ছে

১ ২´ ৩
। র্সা নর্সর্রর্রা নর্সা র্সনর্সা I র্সা র্সা না ধনা। পা ধনা র্সর্রা নর্সা।
ন য়০ন০ তা০ রা০০ আ হা র ছে০ ড়ে ছে০ তা০ রা০

০ ১ ২´
। র্সর্সনর্সা র্সণা পা ধা। মমা -পধধা মপা পা I গা মা পা র্সণণা।
যে০ ম০ জি০ জ্ঞা সে নীর ০০ব ভা০ বে মা গি য়ে ছে০ন্

৩
। মপা -ধধা মগা মা}।
কো০ ০ন্ খা০ নে

আভোগ।

০ ১ ২´
। মো মা ধপা ধা। ণা ণধা পা ধা I না না নর্সর্রা র্সা।
ন য় নে০ র ম ণি০ সে যে ম ক লে০০ র

৩ ০ ১
। র্সনা -র্সা -না -র্সা। না র্সা র্রর্গর্মা র্গর্রা। র্রা র্রর্জ্ঞা র্রা নর্সা I
প্রা ০ ণ্ ০ চ লে গে০০ ছে০ প ড়ে০ আ ছে০

২ ৩ ০
Iনা র্সা নর্সা -র্রা । র্সণা র্সণা -ধা I} । র্সা র্রর্গা র্গা র্গর্মর্পা ।
নী র ব০ ০ শ্ব শা০ ন্ ০ কে ম০ নে পা০০

১ ২ ৩
। র্গর্মা র্রর্জ্ঞা । নর্সা -া Iনর্সা । নর্সা র্সর্রা -া । র্সা । ধণা ধা -পধা} ।
ই০ ব০ আ০ র মা০ আ০ মা০ র্ মা আ০ মা য্০

০ ১ ২
I{মা -মপধা গমা মা । পপা পধণধা নর্সা নর্সনর্সা Iনা র্সর্সা র্রা র্সা ।
কা ন্ত০০ ব০ লে প্রা ণ০০০ দে০ মা০০০ পু নঃ দ র

৩
। র্সা নর্সর্রণা ধপা ধা}II II
শ ন০০০ দা০ নে

সোণার হার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কুক্ষণে ত্রৈলঙ্গ বাহমনী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিল। খান্‌খানান্‌ আহ্‌মদ্‌ আপনার সজ্জিত সেনা লইয়া উত্তরে অভিযানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দারুণ-রোষে আপন বাহিনী লইয়া ত্রৈলিঙ্গের উপর আপতিত হইলেন।

ত্রৈলিঙ্গ যুদ্ধ করিয়াছিল। মানব মৃত্যুর পূর্ব্বে যমের সহিত যেরূপ আশাহীন প্রবল সংগ্রাম করে, ত্রৈলিঙ্গও ধ্বংসের পূর্ব্বে সেইরূপ আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিল। যুদ্ধ-সংঘটনের দায়িত্ব ও অপরাধ তাহার; মরিয়া সে আপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

বিজয় নগর যখন ত্রৈলিঙ্গের সাহায্যার্থ বাহমনী-রাজ্য আক্রমণ করিল, তখন ফিরোজ বিস্মিত হইলেন; কারণ, তিনি ইহা আশা করেন নাই। আহ্‌মদ্‌ সংবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বজ্রপাতের পূর্ব্বে বিদ্যুৎ-শিখা যেমন হাসিয়া উঠে, এ হাস্য সেইরূপ জ্বালাময়, ভয়ঙ্কর এবং তীব্র। ফিরোজ এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভারও ভ্রাতার উপর অর্পণ করিলেন। হাসান পিতৃব্যের সহিত ত্রৈলিঙ্গের সীমান্তে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের দক্ষিণভাগ রক্ষা করিতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে আহ্‌মদ্‌ তাঁহাকে বলিলেন, "শের বার বার আপনার শিকার ত্যাগ করিয়া যায় না। যতদিন রায়চুড়ের উন্নত গিরিশৃঙ্গে বাহমনী-বংশের পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ততদিন হিন্দু ক্ষমতাহীন। কতিপয় গ্রাম অধিকার করিলে দেশজয় হয়

না।" দেহের ও মনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া আহ্‌মদ্ ত্রৈলিঙ্গকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

বিজয়-নগর বাহিনী রায়চূড় অধিকার করিতে পারিল না বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইল। প্রথমে মুদ্‌কলের নিকটে স্থানীয় মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। যাহারা প্রাণে বাঁচিল, তাহারা পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিয়া রায়চূড়ের ভীম প্রাকারের অন্তরালে আশ্রয়-গ্রহণ করিল। উল্লাসে অধীর হইয়া বিজয়নগরের সেনা রায়চূড় অবরোধ করিল। কিন্তু মধুরাও বুঝিলেন সে দুর্গ শীঘ্র অধিকার করা সম্ভবপর নহে। তখনও শত্রুর মূল-সৈন্যের দর্শনলাভ ঘটিল না, দেখিয়া তিনি আশঙ্কিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, আহ্‌মদ্ ত্রৈলিঙ্গের উচ্ছেদসাধন না করিয়া সম্মুখীন হইবেন না। ত্রৈলিঙ্গকে বিপদ্‌মুক্ত করিতে হইলে অবিলম্বে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন। দেবরায় ও সামন্ত-বাহিনী রায়চূড়ের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মধুরাও কৃষ্ণা অতিক্রম করিলেন। রামগীর দুর্গের ধ্বংস-স্তূপে অবস্থান করিবার কালে আহ্‌মদ্ এ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "মূর্খের দল! এরূপ বুদ্ধি না হইলে উহাদের এত দুর্দ্দশা কেন?"

মধুরাও কৃষ্ণার বাম তটে উপস্থিত হইয়া দ্রুতগতিতে ত্রৈলিঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথের সম্মুখে পাঙ্গাল্ দুর্গ—মধুরাওয়ের গতিরোধ হইল। চতুর্দ্দশ দিবসে মধুরাও দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

বিজয়নগর সৈন্য আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। দূরদূর দৃষ্টি চলে গ্রাম জনশূন্য—কোন স্থানে মুষ্টিমাত্র আহার্য্য নাই; ক্ষেত্র তৃণ-শূন্য—মরুভূমির মত ধূ-ধূ করিতেছে। মানুষের সহিত মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে কিন্তু ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ সম্ভবপর নহে। সম্রাটকে আহার্য্য প্রেরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে লিখিয়া মধুরাও পাঙ্গালের সন্নিহিত-প্রান্তরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন।

যেদিন কয়েক শত আহার্য্যপূর্ণ শকট সহিত পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিয়া দেবরায় মধুরাওয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন সে দিন মধুরাওয়ের হৃদয়ে স্তিমিত আশার আলোক একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন মধুরাও জানিতেন না ত্রৈলিঙ্গের পতন হইয়াছে এবং বিজয়ী আহ্‌মদ্ জয়দৃপ্ত বাহিনী লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছেন।

দেবরায়ের নিকট হইতেই মধুরাও রাজধানীর সংবাদ পাইলেন। ত্রৈলিঙ্গের যুবক সন্ন্যাসী তাহার প্রথম অপরাধের কথা বিস্মৃত হইয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। দেবলরাজ সে বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন—যুদ্ধে সন্ন্যাসী নিহত হইয়াছে। দেবল রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক দেবরায়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। দেবরায় পদাতিকগুলিকে ও আপনার দেহরক্ষী সৈন্যগণের অধিকাংশ রায়চূড় অবরোধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নবাগত বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও আপনার পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া মধুরাওয়ের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আহার্য্য দ্রব্য অধিক আনয়ন করিতে পারেন নাই। দুই

সহস্র শকট তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে, পরে আরও আসিবে।

পরদিন প্রভাতে দেবরায় মধুরাওয়ের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। মধুরাও বলিলেন, "দেব! তোমার আগমনের প্রয়োজন ছিল না; সৈন্য লইয়া তুমি আসিলে কেন? বিজয়নগরস্কন্ধাবারে কি সেনাপতির এতই অভাব?" দেবরায় বলিলেন, "তন্দু থাকিলে তাহাকে পাঠাইতে পারিতাম। বিনায়ক রাও আপনার নিকটে, সুতরাং আমি আপনিই আসিলাম। আচ্ছা, এবার তন্দুকে আনিগুণ্ডীতে রাখিয়া এলেন কেন? রাজধানীতে ত দেবল রহিয়াছে!" মধুরাও বলিলেন, "তন্দুর এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। ক্রুদ্ধ হইও না, দেব! রাজধানীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে।" দেবরায় বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজধানীতে এবার দেবলকে রাখিয়াছি, এবার সেখানে বিদ্রোহী হইতে কে সাহস করিবে?" মধুরাও বলিলেন, "দেবলই যদি বিদ্রোহী হয়!" দেবরায়ের মুখ আরক্ত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ হইতে একটি বায়স কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। মধুরাও আপনার চমকিত অশ্বকে সংযত করিতে করিতে বলিলেন, "শান্ত হও দেব! দেবল বিদ্রোহী হইবে বলি নাই, বিদ্রোহী হইতে পারে তাহাই বলিয়াছি।" আবার বৃক্ষশাখা হইতে সেই অমঙ্গল-রব শ্রুত হইল। মধুরাও কটিবন্ধ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া বৃক্ষ অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন; ছুরিকা শাখায় বিদ্ধ হইয়া রহিল। বায়স যেন মধুরাওয়ের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া দুইবার শব্দ করিয়া নিকটস্থ আর একটি বৃক্ষে আশ্রয় লইল।

মধুরাও ললাটের স্বেদ-মোচন করিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল আমার ভ্রাতা, তাহা আপনি ভুলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সে যে আপনার ভাবী জামাতা তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছেন?" মধুরাও কহিলেন "তুমি যে আমার পুত্র, দেব!" সহসা অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া উভয়ে পশ্চাতে চাহিলেন, দেখিলেন বিনায়ক রাও কতিপয় অশ্বারোহীর সহিত আসিতেছেন। বিনায়ক রাও কহিলেন, "শত্রুর দেশ, পাছে কোন বিপদ ঘটে সেই জন্য আসিলাম।" পুনরায় প্রেতের অট্টহাস্যের ন্যায় বায়সের কর্কশনাদ নিস্তব্ধ প্রান্তর চমকিত করিল। মধুরাও বিনায়ক রাওয়ের নিকট হইতে শরাসন গ্রহণ করিয়া শর-সন্ধান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন, নিবিড় ধূলিরাশি উড়াইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সম্মুখ হইতে আসিতেছে। বিনায়ক রাও দুইজন অনুচরের সহিত দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিয়া অগ্রসর হইলেন।

তাহারা বিজয়নগরের সৈন্য—সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল। তাহারা বলিল, প্রায় অর্দ্ধলক্ষ মুসলমান সৈন্য কয়েক যোজন দূরে দৃষ্ট হইয়াছে। পরদিনই তাহারা সম্ভবতঃ পাঙ্গালের সমীপবর্ত্তী হইবে।

যাহারা আসিতেছিল তাহারা আহ্‌মদের অগ্রণী সৈন্য। তাহারা পরদিন বিজয়নগর সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল। মধুরাওয়ের শিক্ষিত পদাতিক সেনা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্শাঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত বিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। আহ্‌মদ্ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "হিন্দু যুদ্ধ করিতে

শিখিয়াছে, কিন্তু এবার রক্ষা নাই।" তিনি হিন্দু-সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আপন সৈন্য ও কৃষ্ণা-তীরের মধ্যে নিষ্পিষ্ট করিয়া বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন।

গভীর রজনী। আকাশে চন্দ্র নাই; গাঢ় কৃষ্ণ নৈশাকাশে অগণ্য তারকা জ্বলিতেছে। হিন্দু-সৈন্য বিজয়ের পরিতৃপ্তিতে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল। শিবির নিস্তব্ধ, অন্ধকারময়; কেবল সতর্ক প্রহরীর ধীর পদ-ক্ষেপ শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল এবং স্থানে স্থানে উল্কার আলোক অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রহরীগণকে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিতেছিল।

মধুরাও নিদ্রা যান নাই। সহসা তাঁহার পট্টাবাসে একজন প্রহরী অপর একটি চরের সহিত প্রবেশ করিল। চর সেখানে রহিল, প্রহরী প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি রহিল সে মধুরাওয়ের নিয়োজিত রাজধানীর চর।

ক্রুদ্ধ বিধাতার অভিশাপে বিজয়নগর ভীষণ ভূমিকম্পে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া নদীর প্রবল উচ্ছ্বাস তাহাকে গ্রাস করিয়াছে এরূপ সংবাদ শুনিলে মধুরাও যত বিস্মিত ও চমকিত না হইতেন, তিনি চর মুখে যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে অধিকতর বিস্মিত ও অধিকতর চমকিত হইলেন। পূর্ব্বদিন তিনি বলিয়াছিলেন দেবল বিদ্রোহী হইতে পারে; কিন্তু সে যে সত্যসত্যই বিদ্রোহী হইবে মধুরাও তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। চর বলিল দেবল বিদ্রোহী হইয়াছেন। মারাপ্পা ও তম্বুরাও কি করিতেছেন বা কি করিবেন তাহা সে বলিতে পারিল না। কিন্ত সে যাহা বলিল তাহা হইতে মধুরাও বুঝিলেন মারাপ্পা ও তম্বুরাওয়ের দ্বারা সে বিদ্রোহ দমন হইবেনা, কারণ রাজধানী সৈন্যহীন, দেবল দক্ষিণ হইতে নূতন সৈন্য আনিয়াছেন; সে সেনা জীবনে মরণে দেবলেরই অনুগমন করিবে।

চর চলিয়া গিয়াছে। মধুরাও বলিয়া উঠিলেন, "দেবল! তুমি যে সিংহাসনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছ তাহা ত' তোমারই জন্য আছে! তুমি কি পাও নাই যাহার জন্য আজ বিদ্রোহী হইয়া আপন দেশের ও আপন বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ? পূর্ব্বে যদি জানিতাম, তবে তুমি আমার পুত্র হইলেও তথাপি তোমাকে ক্ষমা করিতাম না। তুমি যদি আমার জামাতা হইতে আমি হেমের সম্মুখেই তোমাকে হত্যা করিতাম, তোমার ধমনীতে প্রবাহিত বুকের রক্ত তোমাকে রক্ষা করিতে পারিতনা। দেব! তোমার বিশ্বাসের এই ফল!"

মধুরাও সম্রাটের শিবির অভিমুখে চলিলেন।

শরতে।

ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে প'ল
মা কমলার আঁচলখানি,
হতাশ প্রাণে কে আনিল
ধোঁচে ধাক্কায় মধুর বাণী।

বুকের মাঝে গুমটো হাওয়া
রুদ্ধ ছিল দীর্ঘশ্বাসে,
আজ্ কে তা'রে মুক্তি দিল,
সিক্ত করি সিউলি বাসে।

আনন্দ তা'র শুভ্রতাকে
প্রকাশ করে কাশের ফুলে,
আকাশ-বধূ উঠ্‌লো হেসে
কালো মেঘের ঘোম্‌টা খুলে !
নিখিলে আজ পড়্‌লো সাড়া—
'দুয়ার খোল, দুয়ার খোল।

রুদ্ধ বুকের অন্ধকারে
আজকে প্রাণের প্রদীপ জালো !'
দুকূল-ভরা নদীর ঘাটে
শরৎ এসে বাঁধলো তরী,
ফেল্‌ রে মুছে অশ্রু-কণা
পুলক নে' আজ বক্ষ ভরি।

সূর্য্যপূজা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তি প্রথমে শাকদ্বীপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও পরে তথা হইতে সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তির উপাসনা অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যমন্দির-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপন করিয়া সাম্ব শাকদ্বীপ হইতে মগ বা ভোজক-ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন ও সূর্য্য-প্রতিমূর্ত্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই বিষয় আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতে অবগত হই। এই মগগণ কোন নূতন উপাসনাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল কি-না তাহার কোন নিদর্শন ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণে সূর্য্য-সম্বন্ধে নানারূপ ব্রতের বিধান আছে। এই সমস্ত ব্রতে সূর্য্যপূজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ব্রতাঙ্গ সূর্য্যপূজায় কোনস্থানে বৈদিক মন্ত্রের, কোনস্থানে বা পৌরাণিক মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তমী-ব্রত (সপ্তমী-কল্প) উপলক্ষ্যে সূর্য্যপূজার বিধি এইরূপে উক্ত হইয়াছে। আচমনপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করিয়া দেবগৃহে (সূর্য্যমন্দিরে) গমন করিবে। শ্বাসরোধের জন্য নাসিকা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে ও কেশের জল নিবারণ-জন্য যত্নপূর্ব্বক মস্তক (বস্ত্রের দ্বারা) আবৃত করিবে। তাহার পর নানাবিধ শুভ্র পুষ্পের দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে।*

তাহার পর অগ্নিতে ধূপ নিঃক্ষেপ করিবে। প্রথমে গুগ্‌গুলের আহুতি প্রদান করিবে, তাহার পর পুষ্পাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে অগ্নিশিখায় রাখিয়া পরে এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের মস্তকে অর্পণ করিবে। তাহার পর দিব্যপুষ্প ও গন্ধাদি তাম্রপাত্রে স্থাপন করিবে ও অগ্নিতে যত্নপূর্ব্বক গুগ্‌গুলের আহুতিরূপ ধূপ প্রদান করিবার পর অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের এইরূপে আবাহন করিবে।—"হে সহস্রাংশু তেজোরাশি জগৎপতি, আপনি আগমন করুন। হে দিবাকর ! আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই অর্ঘ্য

---

* আচান্তো মৌনমাস্থায় দেবাগারং ততো ব্রজেৎ।
শ্বাসরোধ-নিমিত্তং তু প্রাণমাচ্ছাদ্য বাসসা ॥
শিরঃ প্রাবৃত্য যত্নেন কেশোদকনিবৃত্তয়ে।
ততঃ পূজাং রবেঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ ॥
ভবিষ্য পুঃ ১ম।১৪৩।১৫-১৬

গ্রহণ করুন।” এইরূপে আহ্বান করিয়া ভূমির উপর জানু পাতিয়া বসিবে ও হৃদয়ে আদিত্যকে স্মরণ করিয়া রবিকে অর্ঘ্য-প্রদান করিবে। (১) তাহার পর বলিবে “তুমিই এক-মাত্র রুদ্র ও বসুগণের মধ্যে পুরাতন, শাশ্বত (চিরস্থায়ী); তুমি দিব্যলোকে (দিবি) দেবগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংস্তুত হইয়া থাক। (২) সায়াহ্নকালে “নমো বরুণায় শম্ভবে” (বরুণ-দেবকে নমস্কার করি—শম্ভুকে নমস্কার করি) এই মন্ত্র ও “আকৃষ্ণেন রজসা” এই বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে ধূপপ্রদান করিয়া সূর্য্যপূজক ভোজক (মগ) গর্ভগৃহে (মন্দিরে যে গৃহে দেবপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে) প্রবেশ করিবে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পর

(১) ধূপং ততোঽগ্রজে দদ্যাৎ প্রথমং গুগ্গুলাহুতিম্।
পুষ্পাঞ্জলিং ততো গৃহ্য তিষ্ঠেথাগ্রং প্রযত্নতঃ॥
রবে মূর্দ্ধনি তং দদ্যাদেবং মন্ত্রমুদাহরন্। ভবিষ্য পুঃ
১ম। ১৪৩।১৭-১৮।

* * * * *

গন্ধাদীনিচ দিব্যানি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে॥ ২৫
ধূপং দত্বাগ্রয়ে বীর প্রযত্নাদ্ গুগ্গুল্যাহুতিম্।
অর্ঘ্যপাত্রং ততোগৃহ্য কুর্য্যাদাবাহনং রবেঃ॥ ২৬
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্প্যাং হি মাং কৃত্বা গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ২৭
অনেনাবাহনং কৃত্বা জানুভ্যামবনীং গতঃ।
রবে নিবেদয়েদর্ঘ্যমাদিত্যং হৃদয়ে গতঃ॥ ২৮
(২) নিবেদয়েৎ ততো ধূপং বারুণেতামুদীরয়েৎ।
ত্বমেক এব রুদ্রাণাং বসূনাঞ্চ পুরাতনঃ।
দেবানাং প্রীতিযুক্তস্ত্বং সংস্তুতঃ শাশ্বতো দিবি॥ ৩২ + ৩৩।

* * * * *

অনেন বিধিনা দত্বা ধূপং সূর্য্যায় ভোজকঃ।
উৎক্ষিপেচ্চৈব ধূপেন বিশেদ্ গর্ভগৃহং ততঃ॥ ৩৭
ততঃ প্রবিশ্য ধূপং তু প্রতিমায়ৈ নিবেদয়েৎ।
মন্ত্রেণ মিহিরায়েতি নিক্ষুভায়েতি দিজোত্তমঃ॥ ৬৯

“মিহিরায় নমঃ,” “নিক্ষুভায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যপ্রতিমাকে ধূপ প্রদান করিবে। পরে “রাজ্ঞৈ নমঃ, নিক্ষুভায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রের দ্বারা রাজ্ঞী ও নিক্ষুভাকে ধূপ প্রদান করিবে; পরে অন্যান্য সূর্য্যপরিবারগণকে ও অন্যান্য দেবগণকে ধূপ প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর এইরূপে প্রার্থনা করিবে :—

“হে বিভাবসু, আপনি আমার শক্তি-অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হইলেন। হে নাথ! আমাকে ঐহিক ও আমুষ্মিক (পর জন্মে) কার্য্যসিদ্ধি প্রদান করুন। (১)

সূর্য্যপূজায় যে ক্রম প্রদর্শিত হইল, তাহাতে “মিহিরায়” এই একটী মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘মিহির’ সূর্য্যের একটী নাম। অমরকোষে সূর্য্যনাম-পর্য্যায়ে মিহির শব্দ পাওয়া যায়। (২) মিহির-শব্দটী সেচনার্থ ‘মিহ’— ধাতুর উত্তর উণাদি কিরচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অমর কোষের টীকাকার ভানুজি দীক্ষিত এই-রূপেই পদটী সিদ্ধ করিয়াছেন। (৩) যিনি সেচন করেন অর্থাৎ পর্জ্জন্যরূপে জল বর্ষণ করেন তিনিই মিহির। সূর্য্যের ‘মিহির’ নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাঃ ভান্ডারকর বলেন, মিহির-শব্দ পারস্যভাষার ‘মিহর্’ শব্দের সংস্কৃত আকার। পারস্য ‘মিহর্’ আবেস্তার মিথ্র্ শব্দের অপভ্রংশ। মিথ্র্ শব্দটী মিত্রশব্দের অপভ্রংশ। কণিষ্ক কর্ত্তৃক প্রচলিত

(১) অর্চ্চিতস্ত্বং তথা শক্ত্যা ময়া ভক্ত্যা বিভাবসো।
ঐহিকামুষ্মিকীং নাথ কার্য্যসিদ্ধিং দদস্ব মে॥ ৪৭
(২) “বিকর্ত্তনার্কমার্ত্তণ্ডমিহিরারুণ-পূষণঃ”। ইত্যমরঃ
(৩) ইষিযুধিন্ধিদিশিশ্রুভিদিবিভিদিমন্দিচন্দিতিমিমিহিমুহি-
মুচিরুচিরুধিবন্ধিশুষিভ্যঃ কিরচ্। উ। ১।৫৪
“ধরিত্রীমিহিরশ্রীশঃ কালপুষ্পাঞ্জলিঃ” ভানুজিদীক্ষিত।

মুদ্রায় একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে 'মীরো' এইরূপ লিখিত আছে। স্যর ভাণ্ডারকার বলেন, এই মীরোশব্দ মিহির-শব্দের বাচক। মিহির-উপাসনা প্রথমে পারস্য-দেশে উদ্ভূত হয়; পরে এশিয়া-মাইনর-পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রোম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বিগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বদিকেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের মুদ্রায় মিহির-মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং কুষণবংশীয় কণিষ্কের রাজ্যকালে এই ধর্ম্মমত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মুলতানের মন্দিরও প্রায় সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১)

মিহির-শব্দ কোন্ সময় হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্য-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা স্থির করা সহজ নয়; তবে উণাদি সূত্র রচিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতে মিহিরশব্দ সূর্য্য-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। * সাম্বকর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্য-পূজার জন্য মগগণ ভারতে আনীত হইয়াছিল; তাহারাই সূর্য্য-পূজায় উপযুক্ত পরিচারক,—এই কথা ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে। সুতরাং তাহাদের আচার-ব্যবহারও যে কতক পরিমাণে সূর্য্য-পূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। তবে সূর্য্যোপাসনা বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক না কেন, সূর্য্য-পূজায় ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন সূর্য্যোপাসনার প্রণালী প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সেইজন্য আমরা সূর্য্য-পূজার পদ্ধতির যে বর্ণনা ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহজনক 'মিহিরায়' শব্দ ব্যতীত আর সমস্তই ভারত-বর্ষের দেবপূজা-পদ্ধতি।

সূর্য্যপূজা-পদ্ধতিতে আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাই।—পূজক আচমন করিবার পর শ্বাসরোধের নিমিত্ত বস্ত্র-দ্বারা নাসিকা আবৃত ও কেশের জল অপনয়ন-হেতু মস্তক (বস্ত্র-দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। কোনও স্থানে আছে, 'মস্তক, নাসিকা ও মুখ বস্ত্রপূর্ব্বক ভাল করিয়া আবৃত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। এই আবরণ শিথিল করিবে না।' একস্থলে শতানীক সুমন্তকে কহিলেন, "মগগণের ধর্ম্ম আমাকে বিস্তৃতভাবে ও সংক্ষেপে বলুন। মগগণের ধর্ম্ম পালন করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহাও বলুন।" এই প্রশ্নের উত্তরে সুমন্ত বলিলেন,

(১) On the coins of Kaniska there occurs a figure with the name Miiro—Mihira by its side. Mihira is the sanskritised form of the Persian Mihar, which is a corruption of Mithra, the Avestic form of the Vedic Mitra. The cult of Mihira originated in Persia, and it extended itself up to Asia-Minor and even Rome and the proselytising energy which characterised its first adherents must have led to its extension towards the east also and of this extension the figure of Mihira on Kaniska's coin is an evidence. The cult therefore, must have penetrated to India about the time of that Kusana prince and the Multan temple, which was its original seat, must have been constructed about the same time. Bhandarkar—Vaisnavism p. 154

* গোল্ডষ্টুকর-সাহেব বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উণাদিসূত্রগুলি পাণিনি-ব্যাকরণের পর রচিত হইয়াছে। Althoug it follows from all these premises that the treatise on the Unadi words, the existing collection of Unadi Sutras, is later than the grammar of Panini. —Goldstucker on Panini

"হে মহাবাহু! মগ ত্রিসন্ধ্যা যত্নসহকারে মুখ আবৃত করিয়া শক্তি-অনুসারে অগ্নিকার্য্য (অগ্নিতে হোম) ও সূর্য্যের উপাসনা করিবে। † এইরূপ ভাবে মস্তক, নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূজা অন্য দেবতা-সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আচার মগগণ কর্ত্তৃক সূর্য্য পূজায় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পারস্তদেশীয় পুরোহিতগণের যে এইরূপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। র‍্যাগোজিন্ তাঁহার মিডিয়া-নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন (১) বায়ু, জল, পৃথিবী ও অগ্নি এই ভূত-সকল অতি পবিত্র, অন্য কোন অপবিত্র পদার্থের সংসর্গে ইহাদিগকে অপবিত্র করা উচিত নয়। এই কারণে পারস্ত-পুরোহিত অগ্নিপরিচর্য্যাকালে মুখের উপর একখণ্ড বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে; ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ করিলে তাহার নিঃশ্বাস অতিপবিত্র ভূত অগ্নিকে অপবিত্র করিতে পারিবে না। এই গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে, অথ্বন অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত যখন অগ্নির সম্মুখে দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ পোষাকে আবৃত হইয়া ও মুখ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার দৃশ্য মহিমান্বিত বলিয়া বোধ হয়। র‍্যাগোজিন্-লিখিত পারসি-পুরোহিতগণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, মগগণ সূর্য্য পূজার সময় পারসি-পুরোহিতগণের ন্যায় মস্তক, নাসিকা ও মুখ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিত। এই আচার তাহারা শাকদ্বীপ হইতেই আনয়ন করিয়াছিল।

মগগণ অব্যঙ্গ ধারণ করিত, ইহা প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যভক্ত মগের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।—যিনি সর্ব্বদা সূর্য্য-পূজারত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডোপনয়ন (৭) অব্যংগী (অর্থাৎ অব্যংগধারী ও শুক্লবস্ত্র-সমন্বিত, তাহাকে সৌরযতীন্দ্র বলিয়া জানিবে। (§) অন্য এক স্থানে আছে, ভোজক মুণ্ডিতমস্তক, অব্যংগধর, গৌর (গৌরবর্ণ) শঙ্খ ও পুষ্প-ধারী। পারস্তদেশীয় পুরোহিতগণ পূর্ব্বে অব্যংগ-জাতীয় সূত্র (Kusti) ধারণ করিত। বর্ত্তমান পারসিকগণও কুষ্টি (Kusti) ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্য-ভক্ত ভোজক বা মগগণ কতকগুলি আচার তাহাদের দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। যে মগ বা ভোজকগণ শাকদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষা কি ছিল এবং কোন্ ভাষা তাহারা সূর্য্যের পূজায় ব্যবহার করিত, পুরাণ হইতে তাহা জানিবার উপায়

---

† শিরোনাসামুখং চৈব ভূশমাবৃত্য যত্নতঃ। পূজয়েৎ ভাস্করং বীর শিথিলং তু ন কারয়েৎ॥ ভঃ পুঃ১ম।১৪৩।৫৫

শতানীক উবাচ—

মগানাং ব্রূহি মে ধর্ম্মং সমাস-ব্যাসযোগতঃ।

কথং চ কিং ভবেদ্ ব্রহ্মন্ মগধর্ম্ম-নিবেদনাৎ। ১৭১।১

সুমন্তুরুবাচ—ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েদ্ ভানুমগ্নিকার্য্যন্ত শক্তিতঃ।

কুর্য্যান্ মগো মহাবাহো মুখমাবৃত্য যত্নতঃ॥ ১৭১।৫৫

(১) The elements--air, water earth and fire are pure and holy and must not be defiled by the contact of anything impure. The priest therefore while officiating before the fire wears a cloth before his mouth, that his breath may not sully the supremely holy element. Such a cloth is worn to this day by every Parsi while tending the sacred fire of his own house, or even saying his prayers. —Media (the story of Nations series) by Zenaide A Ragozin P. 114-116.

P. 118-The Athravan Fire-priest is indeed a majestic figure as he stands forth in flowing white robe, the lower part of his face veiled.

(§) জ্ঞেয় সৌরযতীন্দ্রো যঃ পূজানিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুণ্ডোপনয়নো ব্যংগী শুক্লবাসঃসমন্বিতঃ॥ ১৪১।২৭